অধ্যায় ১৩

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স

MAIN TOPIC

বর্তমান সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স এর এবং এই প্রযুক্তি গড়ে ওঠার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান পদার্থবিজ্ঞানের। তোমার হাতে যে ফোন, ল্যাপটপ বা ট্যাবলেট আছে, তা এই আধুনিক জগতের ইলেকট্রনিক্স এর অন্তর্ভুক্ত। এই ইলেকট্রনিক্স সৃষ্টি করেছে "আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান" নামের নতুন শাখা। এই অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়েই জানব।

➢ এই অধ্যায়ের শেষে আমরা :

- ✓ এক্সরে, তেজস্ক্রিয়তা, তেজস্ক্রিয় রশ্মি সম্বন্ধে জানব।
- ✓ ইলেকট্রনিক্সের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানব।
- ✓ অর্ধপরিবাহী ও সমন্বিত বর্তনী ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ✓ কিছু ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস সম্বন্ধে জানতে পারব এবং এদের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ✓ ইন্টারনেট এবং এর জীবনমুখী ব্যবহার সম্পর্কে জানব।
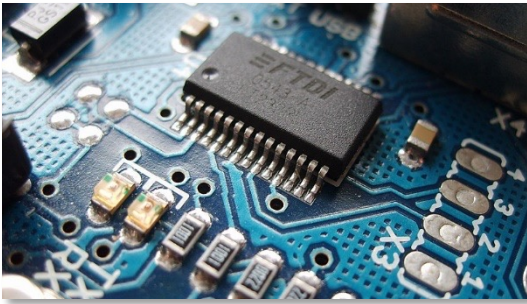
এক্সরে (X-Ray)

এক্সরে হলো ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তাড়িত চৌম্বক বিকিরণ। **বিজ্ঞানী উইলহেলম রন্টজেন ১৮৯৫ সালে x-ray আবিষ্কার করেন।** এই আবিষ্কারের জন্য তিনি পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম নোবেল বিজয়ী হন। হাড়ে ব্যথা নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলে যেই এক্সরে নামক টেস্ট দেয় সেটি এককালে অজানা একটি রশ্মি ছিল। এই রশ্মি তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10^{-8} m থেকে 10^{-13} m এর কাছাকাছি যা সাধারণ আলো থেকে অনেক কম।

এখন চলো বন্ধুরা X-Ray এর বৈশিষ্ট্য দেখি।

✓ এটি উচ্চ ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন। সাধারণত আলোর পথে অস্বচ্ছ পদার্থ থাকলেই তা আর ভেদ করতে পারে না, কিন্তু X-Ray অনেক কিছু ভেদ করতে পারে, তোমার এই বিশাল শরীরটাকেও !

✓ এক্সরে দৃশ্যমান নয়। তাই তোমার মধ্য দিয়ে এক্সরে পাঠালে তুমি টেরই পাবে না, নইলে এক চিৎকার মেরে পাঠিয়ে যেতে।

✓ তরঙ্গদৈর্ঘ্য তো দেখলেই, 10^{-8} m থেকে 10^{-13} m এর কাছাকাছি।

✓ এক্সরে আয়ন সৃষ্টিকারী বিকিরণ গ্যাসের মধ্য দিয়ে যাবার সময় গ্যাসকে আয়নিত করে। অর্থাৎ এক্সরে গ্যাসের মধ্য দিয়ে দৌড়ানোর সময় প্রতিবেশী সবাইকে আয়নিত করে ফেলে!

✓ এই রশ্মি সরলরেখায় গমন করে।

✓ এক্সরে তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ। তড়িৎ ক্ষেত্র বা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয় না।

✓ এক্সরে সাধারণত আলোর ন্যায় প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন ও পোলারায়ন হয়ে থাকে। অনেক নতুন শব্দ? সমস্যা নেই, জানার জন্য ভবিষ্যৎ তো পড়েই আছে !

✓ ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর এর প্রতিক্রিয়া আছে।

✓ কোনো ধাতব পৃষ্ঠে এ রশ্মি আপতিত হলে তা থেকে ইলেকট্রনিক্স নিঃসৃত হয়।

✓ জিঙ্ক সালফাইড, বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড প্রভৃতি পদার্থের রশ্মি প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।

✓ এটি আধান নিরপেক্ষ।

এবারে এই এক্সরের ব্যবহার দেখে আসি। এক্সরের ব্যবহার শুধুমাত্র চিকিৎসাবিজ্ঞানেই নয়, শিল্প কারখানাও রয়েছে।

a) চিকিৎসা বিজ্ঞানে-

1. স্থানচ্যুত হাড়, হাড়ে ফাটল বা ভেঙে যাওয়া, শরীরের ভেতর কোনো ক্ষতের অবস্থান নির্ণয়।
2. ক্যান্সারের চিকিৎসায়, আলসার নির্ণয়ে।

b) শিল্প কারখানায় ধাতব ঢালাইয়ে ত্রুটিপূর্ণ ওয়েল্ডিং, কেলাস গঠন পরীক্ষায়, গহনার যাচাইকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

c) কাঠের বাক্স বা চামড়ার থলেতে বিস্ফোরক লুকিয়ে রাখলে বা চোরাচালানের দ্রব্যাদি খুঁজতে।

এক্সরে দুই প্রকার।

(ক) কোমল এক্সরে (soft x-ray)

(খ) কঠিন এক্সরে (Hard x-ray)

কোমল এক্সরে : এক্সরে যন্ত্রে কম বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করে যে এক্সরে পাওয়া যায় অর্থাৎ যে এক্স-রের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে তাকে কোমল এক্সরে বলে। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হলে ভেদন ক্ষমতা কমে যায়, কারণ এক্ষেত্রে কম্পাঙ্ক কম থাকে।

কঠিন এক্সরে : এক্সরে যন্ত্রে বেশি বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করে যে এক্সরে উৎপাদিত হয় অর্থাৎ যে এক্স-রের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম, ভেদনক্ষমতা বেশি তাকে কঠিন এক্সরে বলে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে গেলে শক্তি বেড়ে যায়, তাই ভেদনক্ষমতাও বাড়ে।

একক : রন্টজেন (Rontgen)

1 রন্টজেন কি?

1 রন্টজেন বলতে সে পরিমাণ বিকিরণ বুঝায় যা স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রায় 1CC বায়ুতে এক স্থির বৈদ্যুতিক আধানের সমান আধান সৃষ্টি করতে পারে।
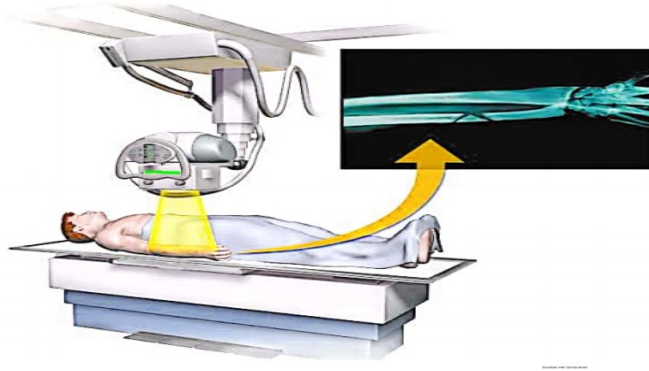
এক্স-রের আবিষ্কার কিভাবে?

এক্স-রের আবিষ্কার ছিল সম্পূর্ণ একটি কাকতালীয় ঘটনা। বিজ্ঞানী রন্টজেন তড়িৎ ক্ষরণের পরীক্ষা করতে গিয়ে লক্ষ করেন যে, কিছু দূরে অবস্থিত পর্দায় প্রতিপ্রভা সৃষ্টি হচ্ছে। পরে তিনি লক্ষ্য করেন যে, তড়িৎক্ষরণ নল থেকে ক্যাথোড রশ্মি যখন নলের দেয়ালে পড়ে তখন এই রশ্মির উৎপত্তি হয়। কি, মজার না ? চলো এক্স-রে উৎপাদন দেখে পুরো ব্যাপারটি বুঝে আসে।

এক্সরে উৎপাদন
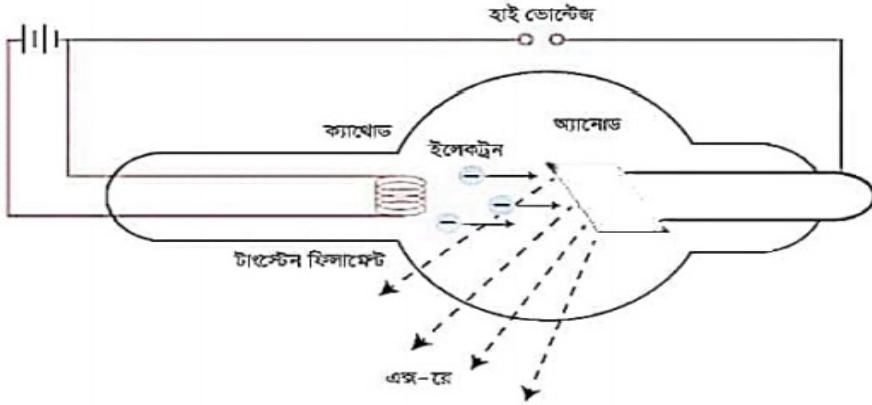
একটি কাচের গোলকের দুই পাশে দুটি ইলেকট্রন থাকে, একটি ক্যাথোড অন্যটি অ্যানোড। টাংস্টেনের তৈরি ক্যাথোডের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে সেটি উত্তপ্ত করা হয়। ফলের ইলেকট্রন তাপীয় নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় ক্যাথোড থেকে মুক্ত হয়ে আসে। তারপর অ্যানোডের উচ্চ বিভবের কারণে সেটি তার দিকে ছুটে যায়। ইলেকট্রনগুলো ত্বরান্বিত হয়ে অ্যানোডরুপী লক্ষ্যবস্তু T-তে আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে এক্সরে সৃষ্টি হয়।

তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity)

আমরা জানি পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউট্রন ও প্রোটন। এই নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যকার প্রবল শক্তিশালী নিউক্লিয়ার বল অর্থাৎ 'সবল নিউক্লিয় বল' এর আকর্ষণে নিউক্লিয়াস স্থিতিশীল থাকতে পারে। নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটন সংখ্যা বাড়তে বাড়তে 82 অতিক্রম করার পর থেকে নিউক্লিয়াসগুলো অস্থিতিশীল হতে শুরু করে। তবে প্রোটন সংখ্যা 82 এর পর সব মৌলই অস্থিতিশীল হতে হবে এমন নয়, এর আগেও কিছু মৌল অস্থিতিশীল। যেমন : C_{14} এর প্রোটন সংখ্যা 6 হলেও এটি অস্থিতিশীল। অস্থিতিশীল মৌল তো বুঝলে, এখন জানা যাক তেজস্ক্রিয় তা কি?

অস্থিতিশীল নিউক্লিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলফা, বিটা, গামাসহ কোনো ধরনের পদার্থ বা রশ্মি বিকিরণ করে স্থিতিশীল হতে চেষ্টা করে। এই ঘটনাকে তেজস্ক্রিয়তা বলে।

অর্থাৎ, যেই অস্থিতিশীল নিউক্লিয়াস গুলো সম্পর্কে জানলে, তারা স্থিতিশীল হওয়ার জন্য যা করে থাকে তাকেই তেজস্ক্রিয়তা বলছি।

x-ray আবিষ্কার এর মাস তিন-এক পর, 1896 সালে ফরাসি বিজ্ঞানী হেনরি বেকেরেল x-ray নিয়ে গবেষণা করে লক্ষ করেন যে, ইউরেনিয়াম ধাতুর নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবিরত বিশেষ রশ্মি নির্গত হয় এবং তা একটি সম্পূর্ণ নতুন মৌল রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত এই নির্গমন চলতেই থাকে।

$$^{238}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + \alpha \text{ (আলফা কণা)}$$
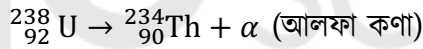
এক্ষেত্রে Uranium থেকে আলফা কণা বিচ্ছুরণ হয়ে Thorium মৌলে রূপান্তরিত হয়েছে। হেনরি বেকেরেলের পর আরনেস্ট রাদারফোর্ড, পিয়ারে কুরি, মেরি কুরি এবং অন্যান্য বিজ্ঞানী রেডিয়াম, পোলোনিয়াম, অ্যাক্টিনিয়াম প্রভৃতি ভারী মৌলের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন।

তেজস্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য :

i. তেজস্ক্রিয় পদার্থ সাধারণত আলফা, বিটা ও গামা এই তিন ধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মি নিঃসরণ করে।

ii. তেজস্ক্রিয়তা একটি সম্পূর্ণ নিউক্লিয় ঘটনা। এর মাধ্যমে নিউক্লিয়াসের ভাঙ্গনের ফলে একটি মৌল আরেকটি নতুন মৌলে পরিণত হয়।

iii. তেজস্ক্রিয়তা একটি প্রাকৃতিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও অবিরাম ঘটনা। চাপ, তাপ, বিদ্যুৎ বা চুম্বকক্ষেত্রের ন্যায় বাইরের কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা এর স্বয়ংক্রিয়তা রোধ বা হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় না।

উল্লেখ্য, কোনো মৌলের একটি আইসোটোপ স্থিতিশীল হলেও আরেকটি আইসোটোপ তেজস্ক্রিয় হতে পারে। যেমন : C_{12}, C_{13} ও C_{14} এর মধ্যে কেবল C_{14} তেজস্ক্রিয়।

তেজস্ক্রিয় রশ্মি : সহজভাবে বললে, **তেজস্ক্রিয় পদার্থ যেই রশ্মি বিকিরণ করে, তাকেই তেজস্ক্রিয় রশ্মি বলে।**

নিচের সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত তিন ধরনের রশ্মির প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে পারবো।

একটি সীসার ব্লকে সরু লম্বা গর্ত করে ওই গর্তের মধ্যে রেডিয়ামজাত তেজস্ক্রিয় পদার্থ রাখা হলো। গর্ত হতে সামান্য দূরে লম্বালম্বিভাবে একটি ফটোগ্রাফিক প্লেট (একটি ধাতব বা কাচের পাতা, যাতে আলোকচিত্র ফেলা যায়) রাখা হলো যাতে রশ্নি প্লেটের উপর পড়তে পারে। এবার সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটিকে একটি বায়ুশূন্য প্রকোষ্ঠের মধ্যে রেখে কাগজের তলের সাথে সমকোণে একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হলো। এখন ফটোগ্রাফিক প্লেট পরিস্ফুটিত করলে দেখা যাবে যে, প্লেটের উপর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দাগ রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, মূল বিকিরণে তিন ধরনের রশ্মি রয়েছে। এবার এই তিন ধরনের রশ্মি সম্পর্কে জানব।

রেডিয়াম থেকে বিকীর্ণ তিন প্রকার রশ্মি
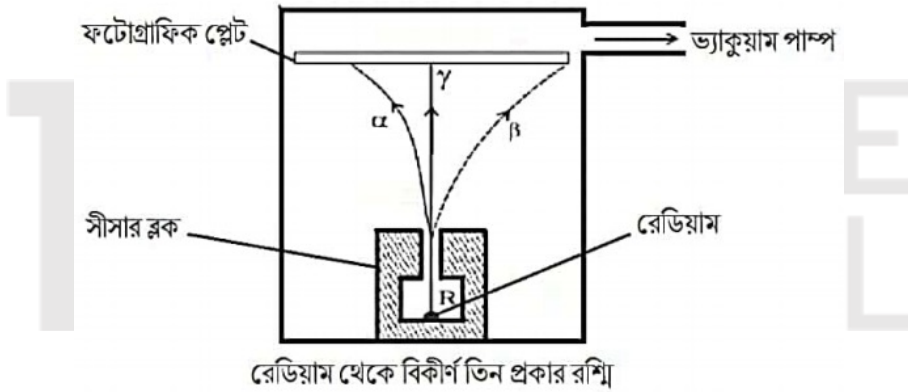
1. আলফা রশ্মির ধর্ম

✓ আলফা রশ্মি হচ্ছে ধনাত্মক আধানযুক্ত আলফা কণার প্রবাহ এবং এই আলফা-কণা হলো মূলত একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। এর আধান 3.2×10^{-19} Coloumb. ${}^{4}_{2}He^{2+}$ হলো আলফা কণা।

✓ একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে থাকে দুটো প্রোটন এবং নিউট্রন। কাজেই এটি চার্জ যুক্ত কণা। সে কারণ এই রশ্মি চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয়। (অর্থাৎ এর গতিপথ প্রভাবিত হয়)।

✓ একটি নিউক্লিয়াসের ভেতর থেকে যখন একটি আলফা কণা বের হয়ে আসে তখন তার শক্তি থাকে কয়েক MeV ($1\ MeV = 1.602\times10^{-13}$ J। কাজেই সেটি যখন বাতাসের ভেতর দিয়ে যায়, তখন বাতাসের অণু-পরমাণুর সেগুলোতে তীব্রভাবে আয়নিত করতে পারে।

✓ এই রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটে প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।

✓ এর ভর বেশি হওয়ায় ভেদনক্ষমতা কম। বাতাসের ভেতর দিয়ে আনুমানিক 6 cm যেতে না যেতেই এটি বাতাস এর অণু-পরমাণু আয়নিত করে সব শক্তি ক্ষয় করে থেমে যায়।

✓ এই রশ্মি জিংক সালফাইট পর্দায় প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।

[প্রতিপ্রভা: আলো শোষিত পদার্থ বা অন্য তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ হতে নিঃসৃত আলোকে প্রতিপ্রভা বলে]

✓ এই রশ্মি প্রচণ্ড বেগে নির্গত হয়।

কোনো তেজস্ক্রিয় মৌল হতে আলফা কণা নির্গত হলে সৃষ্ট নতুন মৌলের ভর সংখ্যা 4 কমে এবং পারমাণবিক সংখ্যা 2 কমে। অর্থাৎ X মৌল Y এ পরিণত হলে,

$$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He^{2+}$$

যেমন :

$$^{238}_{92}X \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He^{2+}$$
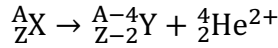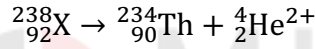
✓ এর গতিপথ সরলরৈখিক।

2. বিটা রশ্মির ধর্ম

✓ বিটা রশ্মি হচ্ছে বিটা কণা অর্থাৎ ইলেকট্রনের প্রবাহ। এই ইলেকট্রন বের হওয়ার জন্য নিউক্লিয়াসের ভেতরের একটি নিউট্রন প্রোটনে পরিবর্তিত হতে হয়।

$$n^0 \rightarrow P^+ + e^- + \bar{\nu}$$ (Anti-neutrino
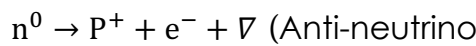
এখানে নিউট্রনের চার্জ শূন্য, এটি প্রজেটিভ চার্জযুক্ত প্রোটন এবং নেগেটিভ চার্জযুক্ত ইলেকট্রনে পরিণত হয়। বিক্রিয়ায় $\bar{\nu}$ অর্থাৎ এন্টি-নিউট্রিনো পদার্থের নিঃসরণ ঘটে। এর কারণ হলো বিক্রিয়াটিতে কৌণিক ভরবেগ এবং মোট শক্তি উভয়পাশে সমান রাখা। এন্টি নিউট্রিনো হলো নিউট্রিনো (পদার্থের অস্থায়ী পদার্থ) এর প্রতিপদার্থ।

✓ বিটা রশ্মি যেহেতু ইলেকট্রন তাই চার্জ নেগেটিভ এবং সে কারণে এটি বিদ্যুৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়।

✓ এই রশ্মি অত্যন্ত দ্রুত নির্গত হয়। এর দ্রুতি আলোর দ্রুতির 98% হতে পারে।

✓ ফটোগ্রাফিক প্লেটে এর প্রতিক্রিয়া আছে।

✓ এর ভর খুবই কম, ইলেকট্রনিক সমান (9.11×10^{-31} kg)

✓ β decay দুই ধরনের হয়ে থাকে।

1. β^-decay [বিকিরিত পদার্থ : ${}_{-1}^{0}e$ (ইলেকট্রন)]
2. β^+decay [বিকিরিত পদার্থ : ${}_{+1}^{0}e$ (পজিট্রন)]

সাধারণত বিটা নিঃসরণ বলতে β^- কেই বোঝানো হয়, তবে β^+decay ও ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের ভেতরের প্রোটনকে নিউট্রন এবং পজিট্রন সৃষ্টি করে।

$$_{1}^{1}P \rightarrow {}_{0}^{1}n + {}_{+1}^{0}e + v \text{ [neutrino]}$$
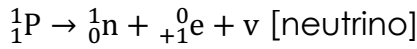
এক্ষেত্রেও কৌণিক ভরবেগ এবং শক্তির সংরক্ষণশীলতার জন্য নিউট্রিনো (v) নিঃসরিত হয়।

✓ এই রশ্মি প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে পারে।

✓ এর ভেদরক্ষমতা আলফা রশ্মি চেয়ে বেশি। কয়েক মিলিমিটার পুরু অ্যালুমিনিয়াম পাত দিয়ে বিটা রশ্মি থামানো যায়।

✓ পদার্থের মধ্য দিয়ে যাবার সময় এই রশ্মি বিক্ষিপ্ত হয়।

✓ এটির গতিপথ বাঁকা এবং গ্যাসে যথেষ্ট আয়নায়ন সৃষ্টি করতে পারে।

β^+decay : ${}_{Z}^{A}X \rightarrow {}_{Z-1}^{\ \ A}Y + {}_{+1}^{0}e + v$

β^-decay : ${}_{Z}^{A}X \rightarrow {}_{Z-1}^{\ \ A}Y + {}_{-1}^{0}e + v$
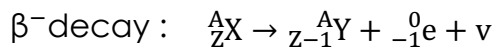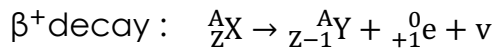
3. গামা রশ্মির ধর্ম

✓ এটি একটি গতিশীল তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। কাজেই এটি আধান নিরপেক্ষ।

✓ এর দ্রুতি আলো সমান অর্থাৎ $3\times10^{8}\ \mathrm{ms^{-1}}$.

✓ এর ভেদন ক্ষমতা আলফা ও বিটা রশ্মির চেয়ে বেশি। এটি বেশ কয়েক সেন্টিমিটার সীসার পাত ভেদ করতে পারে।

✓ স্বল্প আয়নায়ন ক্ষমতা সম্পন্ন।

✓ এই রশ্মি প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে পারে।

✓ এটি ভরহীন।

✓ ফটোগ্রাফিক প্লেটে এটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

✓ এটির আধান নেই বলে তড়িত ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয় না।

✓ এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব কম, তাই শক্তি খুব বেশি।

Example : $^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z}X + \gamma$ (গামা)

যেহেতু γ রশ্মির চার্জ/ভর কিছুই নেই, তাই এই ক্ষেত্রে গামা নিঃসরণের পর মৌলের ভর সংখ্যা বা চার্জের পরিবর্তন ঘটবে না।

এবার শর্টকাটে আলফা, বিটা ও গামারশ্মির তুলনামূলক আলোচনা করি :

বৈশিষ্ট্য	α-রশ্মি	β-রশ্মি	γ-রশ্মি
ভেদনক্ষমতা	কম	মাঝারি	অনেক বেশি
চার্জ	ধনাত্মক	ঋণাত্মক [ধনাত্মকও হয়]	শূন্য
ভর	ভারী	কম ভারী	ভর নেই
বিক্ষিপ্ত করণ	তড়িৎ ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে	তড়িৎ ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে (α এর বিপরীত দিকে)	বিক্ষিপ্ত হবে না
বেগ	কম	মাঝারি	বেশি
আয়নায়ন ক্ষমতা	বেশি	মাঝারি	কম

অর্ধায়ু : একটি তেজস্ক্রিয় মৌলের কোনো নির্দিষ্ট পরমাণু কখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেটি জানা সম্ভব নয়, কিন্তু কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধেক পরিমাণ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার সময় বের করা যায়।

অর্থাৎ, **যে সময়ে কোনো তেজস্ক্রিয় মৌলের/ পদার্থের মোট পরমাণুর ঠিক অর্ধেক পরিমাণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাকে অর্ধায়ু বলে।**

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো মৌলের 100,000 টি তেজস্ক্রিয় পরমাণুর আছে। এর 50,000 টি পরমাণু ক্ষয়প্রাপ্ত হতে অর্থাৎ কোনো নতুন মৌলে পরিণত হতে যে সময় লাগে সেটি হলো ঐ পদার্থের অর্ধায়ু (Half-Life)।

- যেই নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয়তা যত বেশি, তার অর্ধায়ু তত কম।
- স্থিতিশীল নিউক্লিয়াস, যার কোনো তেজস্ক্রিয়তা নেই তার অর্ধায়ুকে অসীম ধরা হয়।

এখন ধরো, **ট্রিটিয়ামের অর্ধায়ু 12.5 বছর। 25 বছর পর ট্রিটিয়াম খন্ডটির কত অংশ অবশিষ্ট থাকবে?**

কি? একটু কঠিন মনে হচ্ছে? অসুবিধা নেই, এখনি বুঝা যাবে।

সমাধান : আমরা জানি, অর্ধায়ু সময়ে মৌলের অর্ধেক ক্ষয় হয়ে যায়।

$\therefore$ 12.5 বছরে ক্ষয় হয় $1/2$ অংশ

আরো 12.5 বছরে ক্ষয় হয় $\frac{1/2}{2}$ অংশ

$\therefore$ $(12.5 + 12.5)$ বছরে ক্ষয় হয় $= (1/2 + 1/4)$ অংশ

বা 25 বছরে ক্ষয় হয় $= 3/4$ অংশ

$\therefore$ 25 বছর পর ট্রিটিয়াম খন্ডটির অবশিষ্ট $= (1 - 3/4) = 1/4$ অংশ

এবার বুঝতে পারলে তো? দেখলে কত সোজা!

তেজস্ক্রিয়তার একক : বেকেরেল (Becquerel)

1 becquerel প্রতি সেকেন্ডে একটি তেজস্ক্রিয় বিভাজন বা তেজস্ক্রিয় ক্ষয়কে 1 becquerel বলে।

তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার : বর্তমান যুগে তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার বলে শেষ করা যায় না। যেমন:

চিকিৎসাক্ষেত্রে

i. তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে রোগ আক্রান্ত স্থানের ছবি তোলা সম্ভব। যেমন- টেকনিশিয়াম–99 ^{99}Tc কে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করালে সেটি যখন নির্দিষ্ট স্থানে জমা হয় তখন ঐ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে গামা রশ্মি দেখা যায়, যার কারণে সেই স্থানের ছবি তোলা সম্ভব হয়। খুব কম অর্ধায়ু থাকায় দেহের ক্ষতিও হয় না।

ii. রোগীকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ^{131}I সমৃদ্ধ দ্রবণ পান করানো হয়। এই আইসোটোপ থাইরয়েড গ্রন্থিতে প্রবেশ করে বিটা রশ্মি নির্গত করে থাইরয়েডের ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে।

iii. টিউমারের উপস্থিতি ও নিরাময়ে ^{60}Co ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে গামা রশ্মি নির্গত হয়।

iv. রক্তের লিউকেমিয়া রোগের চিকিৎসায় ^{32}P ব্যবহৃত হয়।

তাছাড়া কৃষিক্ষেত্রে ও শিল্প কারখানায়ও তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার রয়েছে। সার এবং কীটনাশকের পরিমাণ নির্ণয়, খনিজ পদার্থের বিভিন্ন ধাতুর পরিমাণ নির্ণয়ে, উদ্ভিদ কোষের উন্নতজাত সৃষ্টি, জীবাশ্মের বয়স নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যাপক ব্যবহার আছে।

জীবাশ্মর বয়স নির্ণয়ে C_{14} আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়।

তেজস্ক্রিয় তা সম্পর্কে সচেতন : উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মানবদেহে ক্যান্সার মরণব্যাধি সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া পারমাণবিক চুল্লি বা অন্য কোনো বিকিরণের উৎস থেকে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য বের হয়, যা পরিবেশের মারাত্মক দূষণ ঘটায়। তাই কোথাও কোনো জাতীয় পদার্থ থাকলে সবাইকে সেই ব্যাপারে সচেতন করব।

মৌলিক কণিকা (Fundamental Particle)

যেসব আভিজাত্য কনিকা দ্বারা পদার্থ তৈরি তাদের মৌলিক কণিকা বলে। যেমন- প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন, মেসন, নিউট্রিনো ইত্যাদি।

মৌলিক কণিকার শ্রেণী ৪ টি। যথা-

i. ব্যারিয়ন শ্রেণী (Baryon) : এখানে রয়েছে নিউট্রন ও প্রোটন।

ii. মেসন শ্রেণী (Meson) : এখানে রয়েছে k-মেসন ও π- মেসন।

iii. লেপটন শ্রেণী (Lepton) : এই শ্রেণিতে রয়েছে ইলেকট্রন ও নিউট্রিনো।

iv. গেজ শ্রেণি (Gauge Particle) : এই শ্রেণিতে রয়েছে ফোটন।

বৈশিষ্ট্য :

✓ সকল বিক্রিয়ায় এদের আধান/চার্জ, ভর-শক্তি ও ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে।

✓ সকল ব্যারিয়ণ ও লেপটনের স্পিন 1/2, সকল মেসনের স্পিন 0 এবং ফোটনের স্পিন 1

✓ π−মেসন ও ফোটন ছাড়া সকল কনিকার স্বতন্ত্র প্রতিকনিকা আছে। যেমন : ইলেকট্রনের প্রতিকনিকা পজিট্রন।

✓ আধান ও চৌম্বক মোমেন্ট ছাড়া কণিকা ও প্রতিকণিকা একই রকম।

এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপাতত এতটুকুই, আগামীতে আরও জানবে।
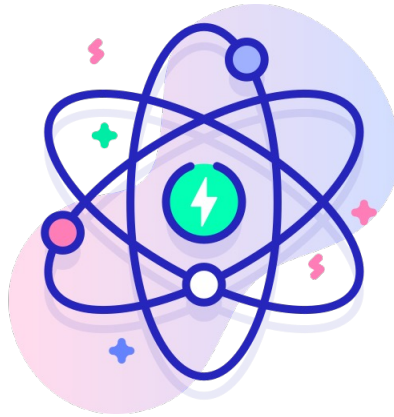
ইলেকট্রনিক্সের ক্রমবিকাশ (Development of Electronics)

ইলেকট্রনিক্সের ক্রমবিকাশ একরাতে ঘটেনি। এর বিকাশের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। ইলেকট্রনিক্সের ক্রমবিকাশকে মোটামুটি তিনটি অংশ– ভ্যাকুয়াম টিউব, ট্রানজিস্টর এবং ইন্ট্রিগ্রেটেড সার্কিট এ ভাগ করা যায়।

ভ্যাকুয়াম টিউব

1883 সালে এডিসন ক্রিয়ায় এডিসন দেখিয়েছিলেন যে লাইট বাল্বের ভেতরে ফিলামেন্ট থেকে অন্য একটি ধাতব প্লেটে ফাঁকা জায়গা দিয়েও বিদ্যুৎ পরিবহন হতে পারে। 1904 সালে জন ফ্লেমিং এডিসন ক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে

প্রথম দুই ইলেট্রোডের একটি ভ্যাকুয়াম টিউব তৈরি করেন। এটি ইলেকট্রনিক্সের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ভ্যাকুয়াম টিউব এসি কারেন্টকে ডিসি করে, অর্থাৎ এটি রেকটিফায়ার হিসেবে কাজ করে। 1906 সালে লিও দ্য ফারস্ট ট্রায়োড তৈরি করেন, যেখানে ইলেকট্রোড ৩ টি। ট্রায়োড অ্যামপ্লিফায়ার (ভোল্টজ নিয়ন্ত্রণ) হিসেবে কাজ করে। 1946 সালে 1800 টি ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যাবহার করে ENIAC নামে প্রথম কম্পিউটার তৈরি হয়।

ট্রানজিস্টর

1946 সালে বেল ল্যাবরেটরীতে প্রথম ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয় এবং এই আবিষ্কারের জন্য জন বারডিন, ওয়াল্টার ব্রাটেইন এবং উইলিয়াম শকলিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। আজকে আমরা যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি, ট্রানজিস্টর আবিষ্কার না হলে এগুলো কখনো তৈরি হতো না। এটি ভ্যাকুয়াম টিউবের তুলনায় ক্ষুদ্র, স্বল্প ওজনের এবং স্বল্প বিদ্যুতে চলে। তাই খরচও কম। এভাবে মানুষের হাতে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি আসতে শুরু হলো।
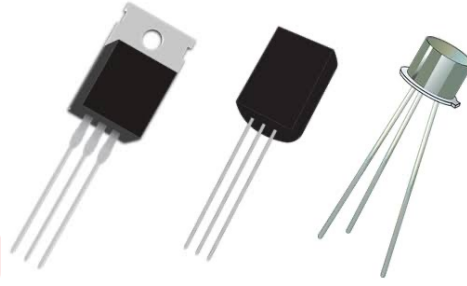
ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC)

পঞ্চাশের দশকে একটি সিলিকনের পাতলা প্লেটে অসংখ্য ট্রানজিস্টর তৈরি করে সেগুলো কেটে কেটে আলাদা করে নেয়া হতো। এরপর ধীরে ধীরে ট্রানজিস্টরের সাথে ডায়োড, ক্যাপাসিটর, রেজিস্টর ইত্যাদি বসিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সার্কিট তৈরি শুরু হলো। এর নাম দেয়া হয় ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা সমন্বিত বর্তনী। ট্রানজিস্টারের সংখ্যা বাড়াতে বাড়াতে তৈরি হয় লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন (LSI) , ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন (VLSI)। এ সার্কিট গুলো সরাসরি সার্কিটের বোর্ডে ব্যবহৃত হতো। মাইক্রো কম্পিউটার, যোগাযোগ উপগ্রহ এ ধরনের অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক্স কল্পনাও করা যেত না।

প্রোগ্রাম করে নিজের প্রয়োজনমতো সার্কিট তৈরি করার IC হলো FPGA (Field Programmable Gate Array)

এনালগ ও ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স

ইলেকট্রনিক্স জগৎ প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত- ডিজিটাল ও এনালগ। ইলেকট্রনিক্সের জগত এনালগ দিয়ে শুরু হলেও এখন ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সই সকল কিছু নিয়ন্ত্রন করছে। এই পর্বে আমরা মূলত এনালগ ও ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের পার্থক্য থেকে এদের বিষয়ে জানব।

এনালগ ও ডিজিটালের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো যে, এনালগ সিগনাল সময়ের সাথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তন হলেও ডিজিটাল সিগন্যাল সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল নয়। এর অবস্থা দুইটি অন এবং অফ। কোন এনালগ সিগনাল যদি 0 থেকে 10 ভোল্টে পরিবর্তিত হতে হয় তাহলে তা সময়ের সাথে শূন্য, এক, দুই করে বাড়তে বাড়তে ১০ পর্যন্ত যাবে। কিন্তু ডিজিটাল সিগনালের হয় শূন্য নয়তো একেবারে দশ হবে। অর্থাৎ ডিজিটাল সিগনালের অন-অফ করতে সময় লাগে না। শব্দ বা ভিডিও ইত্যাদি সিগন্যাল শুরু হয় এনালক হিসেবে এবং সেভাবেই ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সংরক্ষন, প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রেরণ হয় ডিজিটাল সিগন্যালের মাধ্যমে। এনালগ সিগন্যাল ও খুব সহজে নয়েজ প্রবেশ করে সিগনালের গুণগত মান নষ্ট করতে পারে, কিন্তু ডিজিটাল সিগন্যালের গুণগত মান অবিকৃত থাকে।

Analog Signal

Digital Signal

পদার্থের পরিবাহিতা (Conductivity of Matter)

পরিবাহী তারের উপর ভিত্তি করে পদার্থ তিন প্রকার। যথা-

পরিবাহী : যেই পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা আছে। যেমন- কপার, সিলভার, গোল্ড ইত্যাদি।
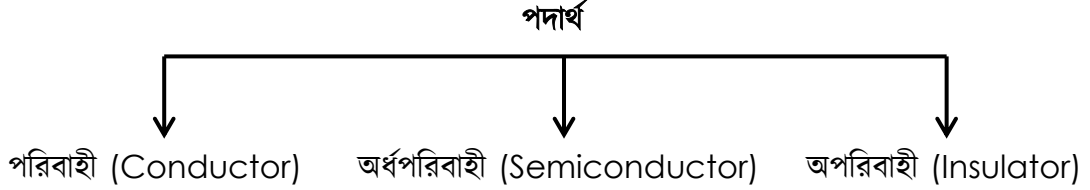
অপরিবাহী : যেই পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা নেই। যেমন- ক্লোরিন, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদি। অপরিবাহীকে অন্তরকও পদার্থ বলে।

অর্ধপরিবাহী : যেই পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা পরিবাহী এবং অপরিবাহীর মাঝামাঝি, যার তাপমাত্রা বাড়াতে থাকলে পরিবহন ক্ষমতা বাড়তে থাকে তাকে অর্ধপরিবাহী পদার্থ বলে।

0 Kelvin তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহী, অপরিবাহীর মত আচরণ করে। এর থেকে তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে এর পরিবাহিতা বাড়তে থাকে।

পরিবাহকের আপেক্ষিক রোধ অনেক কম, $10^{-8}\ \Omega\text{m}$। পরিবাহকে অনেক মুক্ত ইলেকট্রন থাকে, এজন্য পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভবান্তর ঘটলেই মুক্ত ইলেকট্রন গুলো তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে। অপরিবাহীর আপেক্ষিক রোধ বেশি, প্রায় $10^{11}\ \Omega\text{m}$। এতে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না, তাই সাধারণ তাপমাত্রায় এর পরিবহন ক্ষমতা নেই। অর্ধপরিবাহীর আপেক্ষিক রোধ $10^{-4}\ \Omega\text{m}$। অর্ধপরিবাহী বস্তুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে এর আপেক্ষিক রোধ কমতে থাকে। তোমরা চিন্তা করছ যে এই অর্ধপরিবাহী নিয়ে এত আলোচনা কেন ? এর কারণ হলো, **তড়িৎ প্রবাহের জন্য পরিবাহী পদার্থ উত্তম হলেও তড়িৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অর্ধপরিবাহী পদার্থের ভূমিকা অপরিসীম।**

অর্ধপরিবাহীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে এর ইলেকট্রনগুলো কাঁপতে থাকে। সুতরাং উচ্চ তাপমাত্রায় তাপীয় উত্তেজনার দরুন কিছুই ইলেকট্রন মুক্ত হয়, তাই স্বল্প পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ ঘটে।
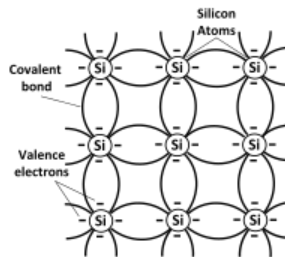
তাপমাত্রা বাড়ালে 1 – 2 টি ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে যাবে, ফলে ঐ অর্ধপরিবাহীতে হোল সৃষ্টি। এই হোল (অর্থাৎ ইলেকট্রন ঘাটতি) পূর্ণ করার জন্য আশেপাশের সিলিকন থেকে e^- যাবে। এভাবে ইলেকট্রন চলাচল করবে এবং বিদ্যুৎ পরিবহন হবে, যদিও এর পরিমাণ খুবই কম।

এবার এই অর্ধপরিবাহীকে শ্রেণীভাগ করা যাক।
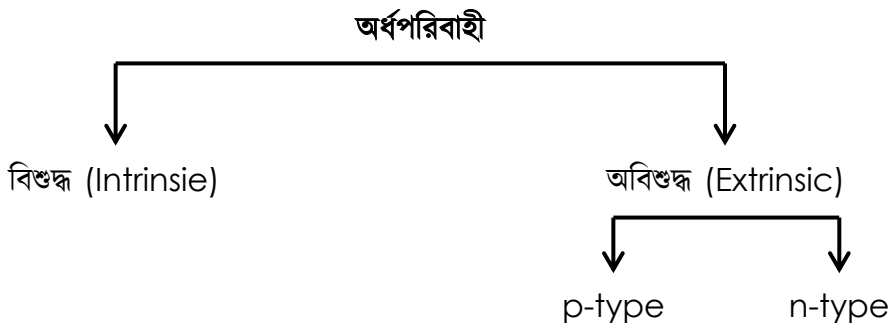
বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর : যে অর্ধপরিবাহী পদার্থ কেবল একটি মৌল থাকে।

অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর : যে অর্ধপরিবাহী বস্তুতে ভেজাল বা খাদ মেশানো থাকে।

পূর্বে আমরা বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর বিদ্যুৎ পরিবহন দেখেছি। এবার অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সম্বন্ধে জানবো।

অর্ধপরিবাহীর পরিবাহকত্ব বৃদ্ধির একটি উপায় হলো এর সাথে নিয়ন্ত্রিতভাবে অতি সামান্য খাদ যোগ করা হয়। একে বলা হয় ডোপায়ন (Doping)। ডোপায়ন পদ্ধতিতে অর্ধপরিবাহী p-type ও n-type এই দুই ধরনের অর্ধপরিবাহীতে পরিণত হয়।

p-type অর্ধপরিবাহী

চতুর্যোজী (যোজনী ৪) অর্ধপরিবাহীর সাথে ভেজাল হিসেবে ত্রিযোজী (যোজনী ৩) মৌল যুক্ত করলে যে অর্ধপরিবাহী সৃষ্টি হয় তাকে p-type অর্ধপরিবাহী বলে। এখন এটি কিভাবে কাজ করে দেখে আসা যাক।

সিলিকনের একটি খণ্ড নেই। এই খন্ডে সিলিকনগুলো সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক সিলিকনের শেষ কক্ষপথের ৮ টি করে ইলেকট্রন থাকে। এর মধ্যে একটিতে ত্রিযোজী মৌল মেশালে (যেমন এলুমিনিয়াম) ঐ ব্যবস্থার মধ্যে একটি ইলেকট্রনের ঘাটতি সৃষ্টি হবে। কিভাবে? বলছি।
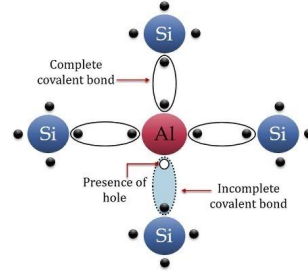
Formation of P type extrinsic semiconductor

প্রত্যেকটি সিলিকন সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে নিজের কক্ষপথে পূর্ণ করে, কিন্তু এর স্থলে Al। চলে আসলে Al ৩টি সিলিকনের সাথে ইলেকট্রন শেয়ার করতে পারবে। আরেকটি সিলিকন তার শেষ কক্ষপথে ৭টি ইলেকট্রন নিয়ে বসে হা-হুতাশ করতে থাকবে। ইলেকট্রনের এই ঘাটতিকে হোল (Hole) বলে। এই সিলিকনের দুঃখ দেখে তার অন্যান্য সিলিকন ভাইয়েরা তাকে ইলেকট্রন দিয়ে দেয়। একটি সিলিকন সেই দুঃখী সিলিকনকে 1টি ইলেকট্রন দিয়ে তার কান্না বন্ধ করলো ঠিকই, কিন্তু নিজের কপালে দুর্ভাগ্য নিয়ে এলো। এখন তার নিজের ইলেকট্রনের ঘাটতি। এই সিলিকনের দুঃখ দেখে নিঃস্বার্থ আরেক সিলিকন ইলেকট্রন দান করে তার নিজের কক্ষপথে হোল সৃষ্টি করবে। এভাবে মনে হবে যে, ব্যবস্থাটির মধ্যে হোল চলাচল করছে। এই সুন্দর ভাতৃত্বের বন্ধন থেকে আমাদের যে লাভ হলো, সেটা হচ্ছে যে ইলেকট্রন চলাচলের একটি ব্যবস্থা হয়ে গেল, অর্থাৎ বিদ্যুৎ পরিবহন হয়েছে। ব্যাস, এভাবেই p-type অর্ধপরিবাহী থেকে অনেক বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া সম্ভব!

n-type অর্ধপরিবাহী

চতুর্যোজী অর্ধপরিবাহীর সাথে পঞ্চযোজী (যোজনী ৫) মৌল যোগ করলে যে অর্ধপরিবাহীর সৃষ্টি হয়, তাকে n-type অর্ধপরিবাহী বলে। এবার দেখে আসি n-type অর্ধ-পরিবাহীর কাহিনীটা কি!
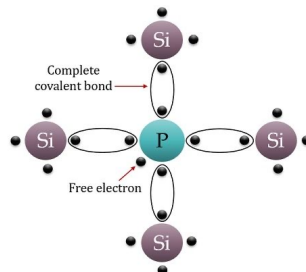
Formation of N type extrinsic semiconductor

এবারও সিলিকন নেয়া যাক। প্রত্যেক সিলিকন তার আশেপাশের 4টি পরমাণু থেকে 4টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে অষ্টক পূর্ণ করে। এখন যদি একটি পঞ্চযোজী মৌল (যেমন ফসফরাস) এই ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে যায়, তখন, 1টি বাড়তি ইলেকট্রন দেখা দেয়। (কারণ ফসফরাসের যোজ্যতা ইলেকট্রন 5টি, সিলিকন গুলোকে দান করবে 4টি ইলেকট্রন)। এই বাড়তি ইলেকট্রন প্রত্যেক সিলিকনের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে থাকে কিন্তু কেউ তাকে গ্রহণ করে না, কারণ সবারই কক্ষপথ পূর্ণ। বেচারা এই ইলেকট্রনের এতসব দৌড়-ঝাঁপ করে তার নিজের কোনো লাভ না হলেও আমাদের কিন্তু মাঝখান দিয়ে অনেক লাভ হয়ে গেছে। কিভাবে? কারণ হলো ইলেকট্রনের চলাচল থেকেই বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয়। সুতরাং এভাবে অনেক বিদ্যুৎপ্রবাহ পেতে পারি।

উল্লেখ্য, p-type অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে majority charge carrier হোল, কেননা এক্ষেত্রে হোলের কারণে অধিক বিদ্যুৎপ্রবাহ পাচ্ছি এবং minority charge carrier ইলেকট্রন (পুরো সিলিকন খন্ডে 1-2 টি বাড়তি ইলেকট্রন থাকে, যার কারণে স্বল্প বিদ্যুৎপ্রবাহ পাওয়া যায় যেমনটি তোমরা পূর্বে শিখেছিলে)।

আবার n-type অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে majority charge carrier ইলেকট্রন এবং minority charge carrier হোল (ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে গেয়ে ইলেকট্রন ঘাটতি সৃষ্টি হওয়ায় 1-2 টি হোলও সৃষ্টি হয়)।

অর্ধপরিবাহী ডায়োড

একটি p-type অর্ধপরিবাহী ও একটি n-type অর্ধপরিবাহী পাশাপাশি জোড়া লাগিয়ে p-n জংশন বা ডায়োড তৈরি করা হয়। ডায়োড পরিবর্তী প্রবাহ (AC) কে একমুখী প্রবাহে (DC) পরিবর্তিত করে, অর্থাৎ এটি রেকটিফায়ার। ডায়োডে বাইরে থেকে কোনো ভোল্টেজ প্রয়োগ করে বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যায়। p-type ও n-type সেমিকন্ডাক্টর ভোল্টেজের সাথে কিভাবে সংযুক্ত করছি সেটির উপর এর বিদ্যুৎপ্রবাহ নির্ভরশীল।
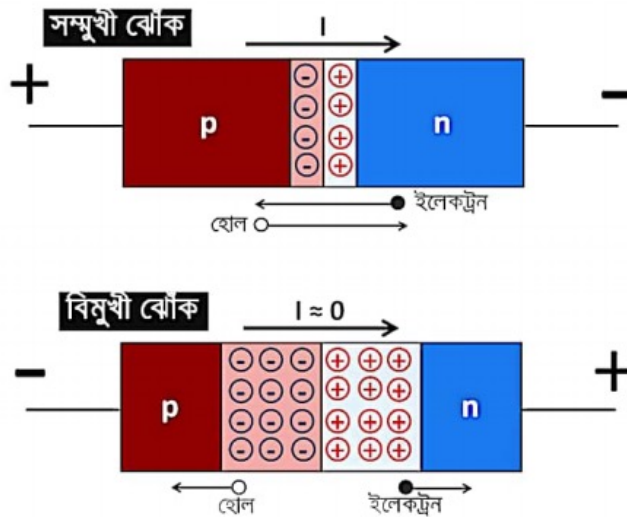
সম্মুখী ঝোঁক ও বিপরীতমুখী ঝোঁক

ভোল্টেজ যদি এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যে ব্যাটারি বা সেলের ধনাত্মক প্রান্ত p-type বস্তুর সাথে এবং ঋণাত্মক প্রান্ত n-type বস্তুর সাথে সংযুক্ত হয় তাহলে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত e^- গুলোকে p-type বস্তুর দিকে এবং ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্ত হোলগুলোকে n-type বস্তুর দিকে টানবে। এখন পুরো ব্যাপারটি বিস্তারিতভাবে জানি।

p-type ও n-type উভয়েরই hole এবং ইলেকট্রন থাকে। তবে p-type এ hole এর ঘনত্ব n-type এর চেয়ে বেশি। তাই e^- p-type থেকে n-type এ যাবে। একই কারণে ইলেকট্রন n-type থেকে p-type এ যাবে। প্রথম e^- p-type এ আসার পর দ্বিতীয় e^- যখন আসবে তখন ঐ প্রথম e^- এর সাথে তার ঢিসুম-ঢিসুম লেগে যাবে অর্থাৎ পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে। কিন্তু দ্বিতীয় ইলেকট্রনটি যেই ব্যাপক শক্তি নিয়ে আসে, তা এই বিকর্ষণ শক্তি থেকে অনেক বেশি হওয়ায় দ্বিতীয় ইলেকট্রনটি প্রবেশ করতে পারবে। এভাবে অল্প কিছু hole কে প্রবেশকৃত অল্প কিছু e^- আকর্ষণ করে ফেলে। **এভাবে পরস্পর আকর্ষণ বলে আবদ্ধ ইলেকট্রন ও হোল একটি স্তর সৃষ্টি করে ফেলে যা depletion layer নামে পরিচিত।**
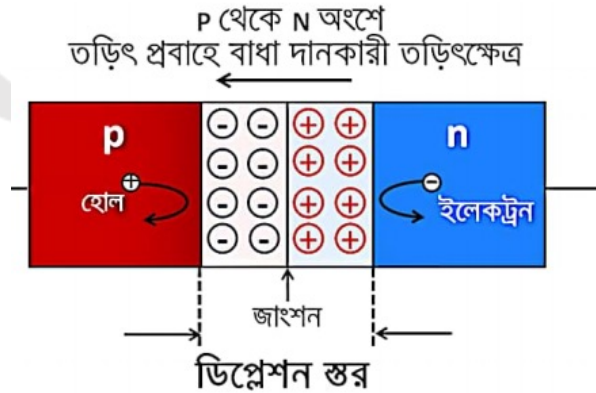
এখন ভোল্টেজের ধনাত্মক প্রান্তের সাথে p-type এবং ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে n-type এর সংযোগ দিলে অর্থাৎ সম্মুখী ঝোঁকে (forward bias) বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক হবে p-type → n-type এর দিকে। ভোল্টেজের ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে e^- গিয়ে n-type এর e^- গুলোকে বিকর্ষণ করবে। এই বিকর্ষণ বলের ঠেলায় depletion layer ভেঙে n-type এর e^- এ যেতে শুরু করবে। সেই e^- গুলো ভোল্টেজের ধনাত্মক প্রান্তের আকর্ষণ এই প্রান্তে এসে পৌছে। এভাবে forward bias এ বিদ্যুত প্রবাহ ঘটে। আশা করি সবাই বুঝে গেছ।

এখন সংযোগের সাথে n-type এবং p-type এর অবস্থান দিলাম পাল্টে। অর্থাৎ ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে n-type এবং ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে p-type । এটিকে বিমুখী ঝোঁক (Reverse bias) বলে। এক্ষেত্রে ভোল্টেজ উৎস থেকে e^- এসে p-type এর হোল পূর্ণ করে ফেলবে। ফলে e^- n-type এ পৌঁছাবেই না এবং বর্তনী পুরো পথে e^-এর পরিবহন হয়নি। ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়নি।
উপরোক্ত ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভোল্টেজ প্রয়োগ করায় p-n জংশন শুধু e^- এক অভিমুখে প্রবাহের অনুমতি দেয়। অর্থাৎ এই জংশনের ইলেকট্রনের একমুখী প্রবাহ ঘটে। সুতরাং এটি রেকটিফায়ার হিসেবে কাজ করে।

ট্রানজিস্টর

ট্রানজিস্টর বর্তনীতে বিবর্ধক (amplifier) ও সুইচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দুই ধরনের অর্ধপরিবাহীর (n-type ও p-type) তিনটি দিয়ে ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয়। এটিতে একটি p-type বস্তুর উভয় পাশে দুটি n-type বস্তু বা একটি n-type বস্তুর উভয় পাশে দুটি p-type বস্তু সংযুক্ত করে যথাক্রমে n-p-n জাংশন বা p-n-p জাংশন তৈরি করা হয়।

এরকমভাবে সজ্জিত ট্রানজিস্টরের প্রথম বস্তুকে নিঃসারক (Emiter), মাঝেরটিকে পিঠ (Base) এবং অন্য পাশেরটিকে সংগ্রাহক (Collector) বলে।
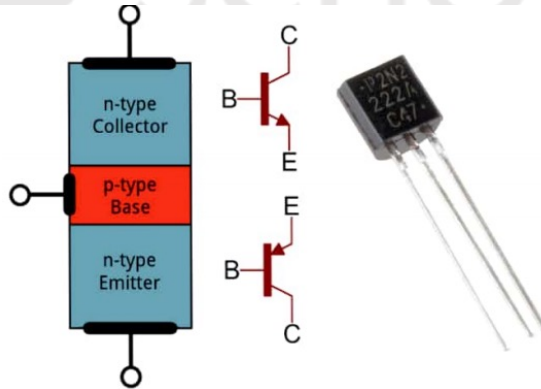
সুতরাং ট্রানজিস্টারে দুটি জংশন থাকে। একটা জাংশন নিঃসারক-পীঠ, অপরটি হলো সংগ্রাহক-পীঠ জাংশন। স্বাভাবিকভাবে, নিঃসারক-পীঠ জংশনে এ থাকে forward bias এবং সংগ্রাহক-পীঠ জংশনে হলো Reverse bias. Forward bias অবস্থায় একটি ক্ষুদ্র বিভব প্রয়োগ করা হলে base দিয়ে শুধু তড়িৎ প্রবাহ চলে তা নয়, বরং পীঠ ও সংগ্রাহকের কারেন্ট প্রবাহে বাধাদানকারী প্রবাহ কমিয়ে দেয়। ফলে জাংশনটি বিদ্যুৎ পরিবহন করে। **ট্রানজিস্টারের মাধ্যমে ৫০-১০০ গুণ বিবর্ধিত তড়িৎ প্রবাহ পাওয়া যায়, তাকে একে অ্যামপ্লিফায়ার বলা হয়।**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত কিছু যন্ত্র

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বিপ্লব এনেছে। রেডিও, টেলিভিশন, সেলফোন, ফ্যাক্স, স্পিকার, মাইক্রোফোন কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদির হাত ধরেই বর্তমান পৃথিবীর এই আধুনিক রূপ। নিম্নে কিছু যন্ত্রের ব্যাখ্যা দেয়া হলো, যেগুলো আমাদের জীবনের চিত্র পাল্টে দিয়েছে।

মাইক্রোফোন ও স্পিকার

কোনো সভা বা অনুষ্ঠানে বক্তাদের মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলতে দেখেছো নিশ্চয়ই। এই মাইক্রোফোন কিভাবে তোমার নিম্ন স্বরকে ম্যাজিকের মতো বাড়িয়ে দিয়ে সবার কাছে স্পষ্ট করে দেয় নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করে। এই কাজটি ঘটায় মাইক্রোফোন স্পিকার মিলে।
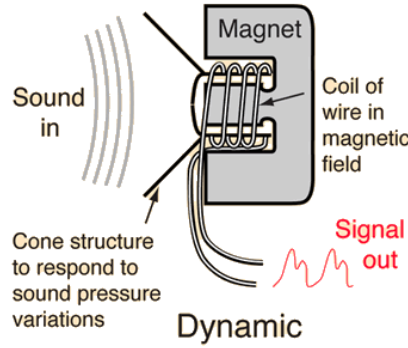
মাইক্রোফোনের সামনে ধাতুর একটি পাতলা পাত বা ডায়াফ্রাম থাকে। ডায়াফ্রামে সামনে একটি কয়েল লাগানো থাকে। কয়েলের সাথে চিত্রে দেখানো উপায়ে চুম্বক লাগানো থাকে। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে যখন কেউ কথা বলে তখন ডায়াফ্রামটি শব্দ তরঙ্গের কম্পনের সাথে কাঁপতে থাকে। ডায়াফ্রামের সাথে লাগানো কয়েলটিও চৌম্বক ক্ষেত্রে সামনে-পেছনে নড়তে থাকে। তাড়িতচৌম্বক আবেশের সংজ্ঞা অনুযায়ী একটি তারের কুন্ডলীর চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তন করার সময় কুন্ডলীর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এভাবে মাইক্রোফোনটি শব্দ শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে। মাইক্রোফোনের কাজ এখানেই শেষ।

এবার স্পিকারের কাজের পালা। স্পিকার মাইক্রোফোনের ঠিক বিপরীত কাজ করে অর্থাৎ বিদ্যুৎ শক্তিকে শব্দে রূপান্তর করে।
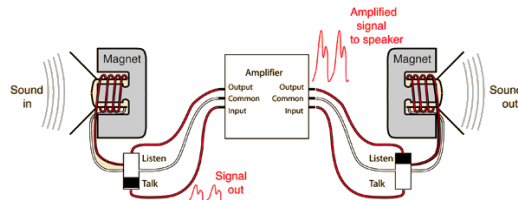
In a simple intercom, the same device can be used as a dynamic microphone and a dynamic loudspeaker.

মাইক্রোফোনের ডায়াফ্রামের বদলে স্পিকারে কয়েলটি হালকা ধাতুর তৈরি শঙ্কুর (Cone) সাথে লাগানো থাকে। শব্দ থেকে তৈরি বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে অ্যামপ্লিফায়ার দিয়ে বর্ধিত করে স্পিকারে পাঠানো হয়। তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য তার পাশে চুম্বকের প্রভাব তারের উপর পড়বে। আমরা জানি চৌম্বক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহী তার রাখলে সেটি বল অনুভব করে। ফ্লেমিংয়ের বামহস্ত নিয়ম অনুযায়ী তারে বিদ্যুৎ প্রবাহ ভেতরের দিকে যাওয়ায় ঊর্ধ্বমুখী বল সৃষ্টি হবে। এই বলের কারণে কয়েল উঠানামা করবে, যা কোনে ধাক্কা সৃষ্টি করবে। এটি যথাযথভাবে কম্পিত হয়ে যথাযথ শব্দ তৈরি করবে যা উৎসের শব্দ হতে অনেকটাই উচ্চস্বরের। এভাবেই তোমার বলা কথা মাইক্রোফোন দিয়ে এত জোড়ে সোনা যায়।

রেডিও

বেতার তরঙ্গকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : Microwave, Radar Wave টেলিভিশন তরঙ্গ। সাধারণত কোনো অ্যারিয়েল বা এন্টেনা দ্বারা ইলেকট্রনকে স্পন্দিত করে বেতার তরঙ্গ তৈরি করা হতো। এই বেতার তরঙ্গ ব্যবহারকারী প্রথম দিকের যন্ত্র হলো রেডিও।

রেডিও আবিষ্কারে যে সকল বিজ্ঞানী অবদান রেখেছেন তারা হলেন জার্মানির হাইনরিখ হার্জ, বাংলাদেশের স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু, ইতালির গুগলিয়েলমো মার্কনি এবং আমেরিকার লি দ্য ফরেস্ট। রেডিওতে আমরা যে শব্দ শুনতে পাই তা কিভাবে আসে জানতে চাও? চলো জেনে আসি।

কোনো রেডিও সম্প্রচার স্টেশনে কোনো ব্যক্তি মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলল, মাইক্রোফোন ঐ ব্যক্তির মুখ থেকে বের হওয়ার শব্দ তরঙ্গকে বিদ্যুৎ সিগন্যালে রূপান্তরিত করে। এটাকে বাহক তরঙ্গ (carrier wave) নামের এক প্রকার উচ্চ-কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গের সাথে মিশ্রিত করা হয়। এই মিশ্রণ তরঙ্গকে বলা হয় মডুলেটেড তরঙ্গ। এই তরঙ্গকে এমপ্লিফায়ার দিয়ে বর্ধিত করা হয় এবং এন্টেনায় সাহায্যে ভূমি তরঙ্গ (Ground Wave) ও আকাশ তরঙ্গ (Skype wave) নামে দুই তরঙ্গে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ভূমি তরঙ্গ সরাসরি গ্রাহক অ্যান্টেনার পৌঁছায়। আমাদের ঘরের রেডিও গ্রাহক যন্ত্র। আকাশ তরঙ্গ বায়ুমণ্ডলের আয়নমন্ডলে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে যা গ্রাহক কেন্দ্রের এরিয়েলে ধরা পড়ে।

গ্রাহক যন্ত্র বেতার তরঙ্গকে গ্রহণ করে একে তড়িৎ প্রবাহে রূপান্তরিত করে। এরপর Demodulation প্রক্রিয়ায় বাহক তরঙ্গ হতে শব্দ তরঙ্গ আলাদা করে নিয়ে তরঙ্গ এমপ্লিফায়ারের সাহায্যে তড়িৎ প্রবাহকে বর্ধিত করে এবং লাউড স্পিকারে প্রেরণ করে। লাউড স্পিকার তড়িৎ সংকেতকে পুনরায় শব্দে পরিণত করে যা আমরা শুনতে পাই। কি ভাবছো? যে এত কাজ কখন হয় ? তুমিতো লাইভ রেডিও শুনো। এসব হতে হয়তো 1 সেকেন্ডও লাগেনা। এবার বিশ্বের অগ্রগতির কথা তুমিই ভাবতে থাকো।

উল্লেখ্য, **যে গ্রাহক তরঙ্গের বিস্তার বাড়িয়ে বা কমিয়ে সিগন্যালটি যুক্ত করা হয় তাকে AM (Amplitude Modulation) রেডিও বলে।** যদি Amplitude সমান রেখে কম্পাঙ্ক পরিবর্তন করে মডুলেট করা হতো তাহলে বলা হতো FM (Frequency Modulation) রেডিও।
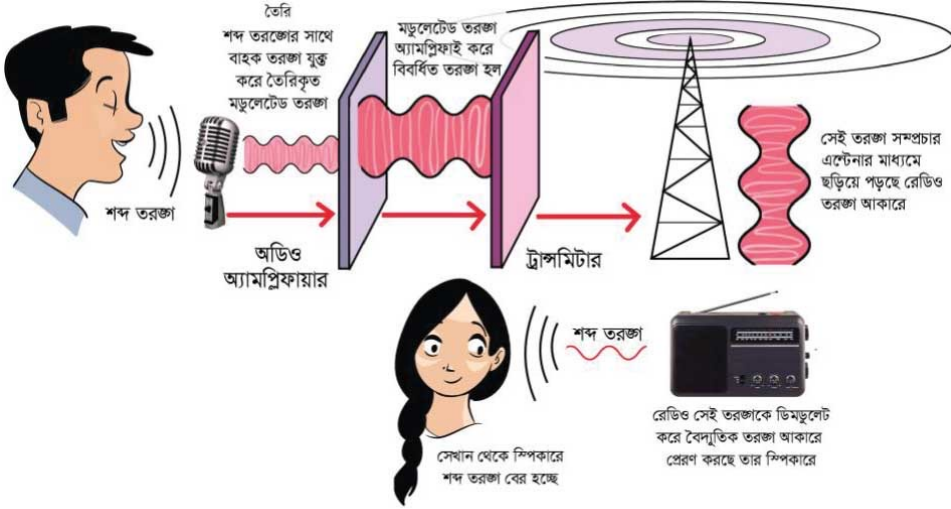
টেলিভিশন

টেলিভিশন হলো এমন একটি যন্ত্র যার সাহায্যে আমরা দূরবর্তী কোনো স্থান থেকে শব্দ শোনার সঙ্গে বক্তার ছবিও টেলিভিশন পর্দায় দেখতে পাই। **1926 সালে জন লগি বেয়ার্ড প্রথম টেলিভিশনে চিত্র প্রেরণে সক্ষম হয়েছিলেন।** টিভিতে শব্দ প্রেরন রেডিওর অনুরূপ। তবে চিত্র বা চলমান ছবি পাঠানোর ব্যাপারটি শিখব এখন।

টেলিভিশন ক্যামেরা কোনো দৃশ্যের ছবির উজ্জ্বল এবং অনুজ্জ্বল অংশকে তড়িৎ আধান বা চার্জে রূপান্তরিত করে। ক্যামেরা লেন্সের পেছনে থাকে একটি পর্দা যার ওপর সিজিয়াম নামক একটি আলোক সংবেদী পদার্থের আস্তরণ থাকে। এই লেন্স যখনই কোনো দৃশ্যের দিকে নির্দেশ করা হয়, লেন্সে যে ছবিটি দেখা যায় তা লেন্স মোজাইক পর্দায় ফোকাস করে। ফলে সিজিয়াম বিন্দুগুলো ইলেকট্রন নির্গমন করে অর্থাৎ আধানযুক্ত হয়। উজ্জ্বল আলো কোনো বিন্দুতে আপতিত হলে তা থেকে বেশি ইলেকট্রন বের হয় এবং বেশি পরিমান তড়িৎ উৎপাদিত হয়। অনুজ্জ্বল আলোতে কম। সুতরাং টেলিভিশন ক্যামেরায় পূর্ণাঙ্গ ছবিটি হয় তড়িৎ চার্জ বা ইলেক্ট্রন দ্বারা সৃষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ অভিন্ন ছবি। এভাবে টেলিভিশনে ছবি পাঠায়।

এরপর টেলিভিশন ক্যামেরা প্রতিটি ছবিকে লাল, সবুজ ও নীল এই তিন ভাগে ভাগ করে তিনটি আলাদা ছবি তুলে নেয়। টেলিভিশন ক্যামেরার ভেতরে আলোকে **CCD (Charge Coupled Device)** ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তরিত করা। এই সিগন্যালকে উচ্চ কম্পাংকের রাফ তরঙ্গের সাথে যুক্ত করে অ্যান্টেনার ভেতর দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

গ্রাহক যন্ত্র বা টেলিভিশন তার অ্যান্টেনা দিয়ে উচ্চ কম্পনের বাহক তরঙ্গকে গ্রহণ করে এবং রেকটিফায়ার দিয়ে বাহক তরঙ্গকে সরিয়ে মূল ছবির সিগন্যালকে বের করে নেয়। আগেই সিগন্যাল থেকে তিনটি ছবিকে ক্যাথোড রে টিউব নামক পিকচার টিউবে তার স্ক্রিনে ইলেকট্রন গান দিয়ে প্রক্ষেপণ হতো। এখন পিকচার টিউব প্রায় উঠেই গেছে। **LED (Light Emitting Diode)** টেলিভিশন তার জায়গা দখল করেছে। এখানে ইলেকট্রন গান দিয়ে স্ক্রিনে ছবি তৈরি না করে লাল সবুজ ও নীল রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র LED তে বিদ্যুৎ প্রবাহ করে ছবি তৈরি করা হয়।

চিত্র: টেলিভিশন সম্প্রচার প্রক্রিয়া

উল্লেখ্য যে কো-এক্সিয়াল ক্যাবল দিয়েও সিগনাল পাঠানো। এই ধরনের টিভি সম্প্রচার ক্যাবল টিভি নামে পরিচিত। এছাড়া স্যাটেলাইট টিভি নামের টিভি অনুষ্ঠানও সম্প্রচার।

টেলিফোন

টেলিফোন হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত একটি যোগাযোগ মাধ্যম। ল্যান্ডফোন আর মোবাইল টেলিফোন রূপে টেলিফোন দেখা যায়।

ল্যান্ডফোন

1875 সালে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার করেন। ল্যান্ডফোনে পাঁচটি উপাংশ থাকে। যথা :

✓ সুইচ : যেটি মূল টেলিফোন নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত অথবা বিচ্ছিন্ন করে।

✓ রিংগার : যেটি শব্দ করে জানিয়ে দেয় যে কেউ একজন যোগাযোগ করছে।

✓ কি-প্যাড : জেটি ব্যবহার করে নাম্বার ডায়াল করা যায়।

✓ মাইক্রোফোন : যেটি আমাদের কণ্ঠস্বরকে বৈদ্যুতিক সিগনালে পরিবর্তন করে।

✓ স্পিকার : যেটি বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে শব্দে রূপান্তর করে শোনার ব্যবস্থা করে দেয়।

প্রত্যেক ল্যান্ডফোনই তামার তার দিয়ে আঞ্চলিক অফিসের সাথে যুক্ত থাকে।

আমরা যখন কথা বলার জন্য কোনো নাম্বার ডায়াল করি তখন আঞ্চলিক অফিসে সেই তথ্যটি পৌঁছে যায়। সেখানে একটি সুইচ বোর্ড থাকে, যেটি নির্দিষ্ট গ্রাহকের টেলিফোনের সাথে যুক্ত করে দেয়। যদি আমরা অনেক দূরে কিংবা ভিন্ন কোনো দেশে একজনের সাথে কথা বলতে চাই তখন সুইচবোর্ডে সেভাবে আমাদের নির্দিষ্ট নেটওয়ার্ক এর সাথে যুক্ত করে দেয়।

তবে এখন আধুনিক যুগে ভ্রাম্যমাণ টেলিফোন অর্থাৎ মোবাইল টেলিফোন বা সেলফোনই বেশি ব্যবহৃত হয়। তাই টেলিফোনে কথাবার্তা বলা এখন খুব সহজ হয়ে গেছে।

মোবাইল টেলিফোন

মোবাইল টেলিফোন তারবিহীন হওয়ায় এটি ব্যবহার করা সহজতর। এটি রেডিও বা বেতার তরঙ্গ দিয়ে যোগাযোগ করে। এটি মূলত রেডিও ট্রান্সমিটার।

মোবাইল টেলিফোনেও টেলিফোনের মত ৫ টি উপাংশ থাকে। এর সাথে আরও যেসব বিষয় রয়েছে-

✓ ব্যাটারি : এটি দিয়ে মোবাইল ফোনের জন্য বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করা হয়।

✓ স্ক্রীন : এখানে মোবাইল ফোনের যোগাযোগ তথ্য দেখানো হয়।

✓ সিম কার্ড : **SIM (Subscriber Identity Module)** যেখানে ব্যবহারকারীর তথ্য গুলো সংরক্ষন হয়।

✓ রেডিও ট্রান্সমিটার ও রিসিভার : এগুলো দিয়ে মোবাইল ফোন তার নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ করে।

✓ ইলেকট্রনিক সার্কিট : মোবাইল ফোনের জটিল কার্যক্রমকে সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সাহায্য করে।

নেটওয়ার্কিং

মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করার কাজটি সম্পন্ন করার জন্য পুরো এলাকাকে অনেকগুলো সেলে ভাগ করে নেয়। প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে এই সেলগুলোর ব্যাসার্ধ 1 থেকে 20 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। প্রত্যেকটি সেলে একটি করে বেস স্টেশন (BTS : Base Transceiver State) থাকে। একটি এলাকার অনেকগুলো বেস স্টেশন কন্ট্রোলারের (BSC : Base Station Controller) মাধ্যমে মোবাইল সুইচিং কেন্দ্রের (MSC : Mobile Service Switching) সাথে যোগাযোগ করে।

প্রেরক যখন গ্রাহকের নাম্বার ডায়াল করে তখন প্রেরকের মোবাইল ফোনটি সে যে সেলে আছে তার বেশ স্টেশনের সাথে যুক্ত হয়। সেই বেস স্টেশন থেকে তার কলটি BSC এর ভেতর দিয়ে মোবাইল সুইচিং কেন্দ্রে পৌঁছায়। MSC তার কাছে রাখা তথ্যভান্ডার থেকে গ্রাহক সেই মুহূর্তে যেই সেলের ভেতর আছে সেটির বেস স্টেশনের সাথে যুক্ত করে দেয় এবং সেই বেস স্টেশন থেকে গ্রাহকের মোবাইল ফোনে রিং দেওয়া হয়।

আমাদের মোবাইল টেলিফোন থেকে খুব কম শক্তির সিগন্যাল ব্যবহার করে কাছাকাছি বেস স্টেশনের সাথে যুক্ত করা হয় এবং আমরা যখন সেই সেলে যাই সেই সেলের বেস স্টেশনে যোগাযোগটি পাঠিয়ে দেয়।

শহর অঞ্চল

BTS টাওয়ার

BTS টাওয়ার

BSC

MSC

BTS টাওয়ার

গ্রাম অঞ্চল

Call Dialing → প্রেরকের ফোন তার BTS এর সাথে যুক্ত হয় → Call টি BSC দিয়ে MSC তে পৌঁছায় → MSC Call reciever এর BTS এর মাধ্যমে reciever এর ফোনের সাথে সংযুক্ত হয় → রিসিভারের ফোনের রিং
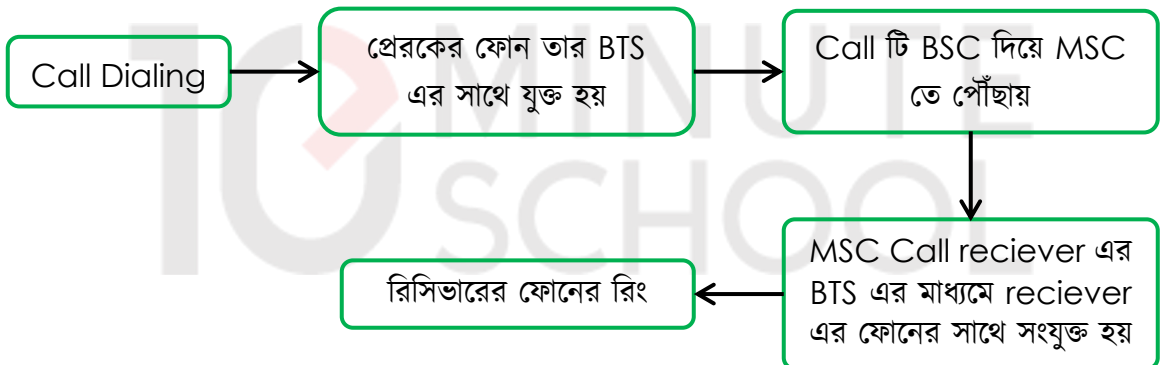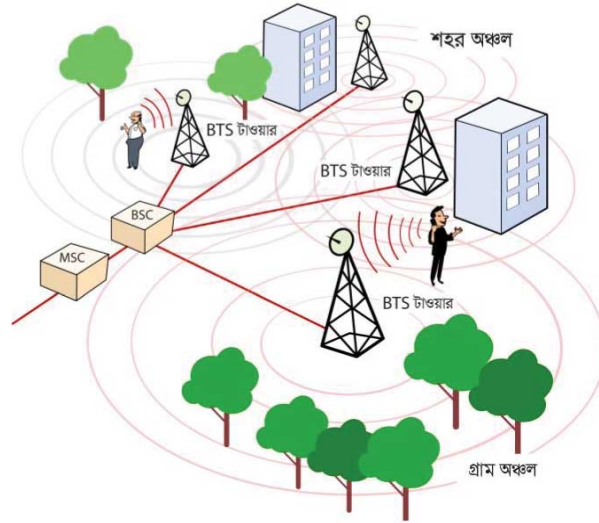
ফ্যাক্স

ফ্যাক্স শব্দটি হচ্ছে Facsimile (ফ্যাক্সিমিল) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। কোনো ডকুমেন্টকে কপি করে টেলিফোন লাইন ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে সরাসরি পাঠিয়ে দেয়াই হলো ফ্যাক্স। ফ্যাক্সের ধারণা পেটেন্ট করা হয় টেলিফোন আবিষ্কারের 30 বছর আগে, যদিও ফ্যাক্স টেলিফোন লাইন দিয়ে পাঠানো হয়।

ফ্যাক্স মেশিন।

ফ্যাক্স মেশিনে যখন একটি ডকুমেন্ট দেওয়া হয় তখন সেখানে উজ্জ্বল আলো ফেলা হয়, ডকুমেন্টের কালো অংশ থেকে কম এবং সাদা অংশ থেকে বেশি আলো প্রতিফলিত হয়, সেই তথ্যগুলো সংরক্ষণ করে ডকুমেন্টটির কপিকে বৈদ্যুতিক সিগনাল রূপান্তর করে টেলিফোন লাইন দিয়ে পাঠানো হয়।

টেলিফোন লাইনের অন্যপ্রান্তে ফ্যাক্স মেশিনটি তার কাছে পাঠানো ডকুমেন্টের কপিকে একটি কপিকে প্রিন্টারে প্রিন্ট করে দেয়। ফ্যাক্স রঙিন কিংবা ফটোগ্রাফের জন্য উপযুক্ত নয়। এছাড়া বেশিরভাগ ফ্যাক্স মেশিনে থার্মাল পেপার ব্যবহার করা হয় বলে ডকুমেন্টটি খুব তাড়াতাড়ি অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে।

রাডার (Radar)

রাডার এমন একটি যন্ত্র যার সাহায্যে দূরবর্তী কোনো বস্তুর উপস্থিতি, দূরত্ব ও দিক নির্ণয় করা যায়। Radar হচ্ছে Radio Detection And Ranging এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

রাডারে যেসব যন্ত্রপাতি থাকে তাদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

✓ প্রেরক যন্ত্র : এই যন্ত্র থেকে নির্দিষ্ট শক্তি বিকীর্ণ হয় যাতে দূরবর্তী বস্তুটি থেকে বিকিরণ প্রতিফলিত হতে পারে। রাডারে মাইক্রোওয়েভ ব্যবহৃত হয়

✓ গ্রাহক যন্ত্র : এটি প্রেরক যন্ত্রের অবস্থানেই থাকে। এর সাহায্যে লক্ষবস্তু থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গ গ্রহণ করা যায়।

✓ নির্দেশক : প্রাপ্ত তথ্যকে উপস্থাপনের জন্য একটি ক্যাথোড রে টিউব, এটি নির্দেশক।

রাডারের ব্যবহার :

i. দূরপাল্লার শত্রু বিমান বা শত্রু জাহাজ খুঁজে বের করতে রাডার ব্যবহার করা।

ii. আক্রমনাত্মক ও রক্ষণাত্মক যুদ্ধাস্ত্রের সঠিক নিয়ন্ত্রণে রাডার ব্যবহৃত হয়।

iii. মিসাইল (Missile) ব্যবস্থাকে ব্যবহারের নির্দেশনা ও আদেশ দানে ব্যবহৃত হয়।

কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও ইমেইল

কম্পিউটার

কম্পিউটার শব্দের অর্থ গণক বা ব্যবহারকারী। কিন্তু বর্তমানে কম্পিউটার দ্বারা কত হাজার কাজ করা সম্ভব সেটি বলে তোমাদের আর সময় নষ্ট করবো না, কেননা সেটি আমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছি !

কম্পিউটার যেখানে তথ্য সংগ্রহ করে তাকে বলা হয় অন্তর্গামী (Input), যেখানে তথ্য ও প্রক্রিয়াজাত করা হয় সেটিকে বলে Central Processing Unit (CPU) এবং যেই প্রান্ত থেকে ফলাফল পাওয়া যায় তাকে বলা হয় বহির্গামী (output)।

কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট
(Central Processing Unit)

স্মৃতি ইউনিট
(Memory Unit)

অন্তর্গামী (Input)

নিয়ন্ত্রণ ইউনিট
(Control Unit)

বহির্গামী (Output)

গাণিতিক ইউনিট
(Arithmatic logic Unit)
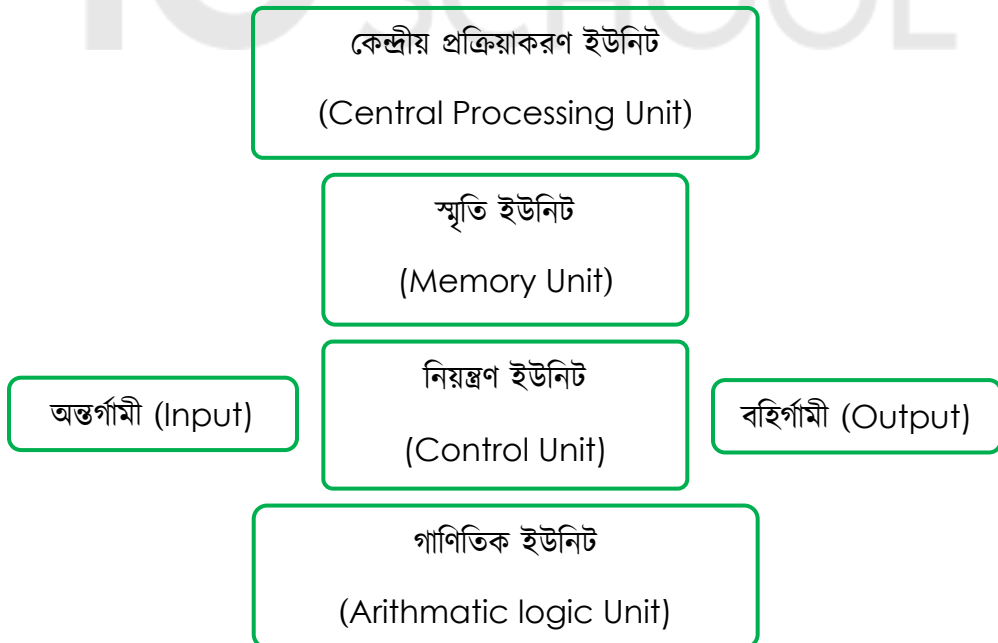
চিত্র : কম্পিউটারের মৌলিক কাঠামো

কম্পিউটারের ব্যবহার :

চিকিৎসা : রোগীর পরিচয়, ঠিকানা, রোগীয় লক্ষণ ইত্যাদি রেকর্ড রাখা, ঔষধ নির্বাচন, চোখ পরীক্ষা, এক্সরে বা অন্য পরীক্ষা, হাসপাতালের হিসাব-নিকাশ, রোগীয় অ্যাপোয়েন্টমেন্ট ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবসা বাণিজ্য : পণ্যের মজুদ নিয়ন্ত্রন, ব্যবসায়িক যোগাযোগ, টিকেট বুকিং, ব্যাংকিং সিস্টেম ইত্যাদি।

যাতায়াত ব্যবস্থা : জাহাজ, বিমান ও মোটরগাড়ি, ট্রেন ইত্যাদি যানবাহনের ট্রাফিক কন্ট্রোল, গতি নিয়ন্ত্রণ, টিকেট বুকিং ইত্যাদি কাজসহ মহাশূন্যযান পাঠানো, নিয়ন্ত্রণ, চলাচল ইত্যাদিতে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

শিক্ষা : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ, স্বশিখন, পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ফলাফল কাজ, ই-ক্লাসরুম ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।

এছাড়াও শিল্প কারখানা, প্রতিরক্ষা, গবেষণা, মুদ্রণ ব্যবস্থা, আবহাওয়া অফিসে, ডিজাইন কাজে কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার হয়।

ইন্টারনেট

একটি কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারের রিসোর্স ব্যবহার করার জন্য নেটওয়ার্কের প্রয়োজন হয়। ছোট একটি এরিয়ার জন্য সে নেটওয়ার্কে বলা হয় **LAN (Local Area Network).** আজকাল LAN তৈরি করার জন্য একটি সুইচের সাথে অনেকগুলো কম্পিউটার যুক্ত করে সুইচ গুলোকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে দিতে হয়।

একটি প্রতিষ্ঠান একটি LAN কে অন্য একটি LAN এর সাথে যুক্ত করার জন্য রাউটার ব্যবহার করা হয়।
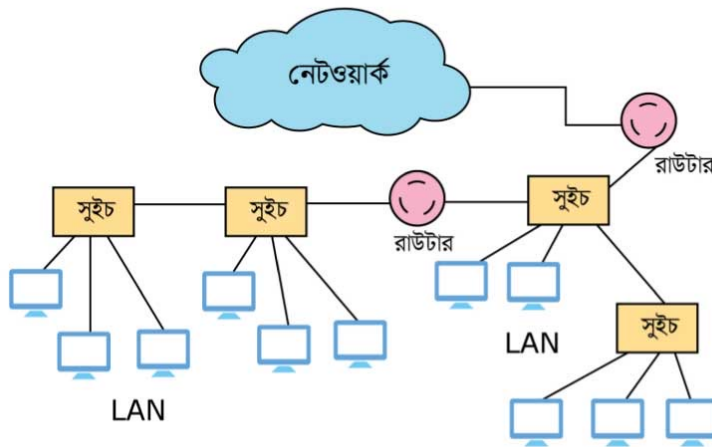
বিভিন্ন নেটওয়ার্কের নিজেদের মাঝে Inter Connection করে Networking কে Internet বলে। Internet এ প্রাইভেট, পাবলিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি স্থানীয় বা বৈশ্বিক সব ধরনের নেটওয়ার্ক জড়িত আছে।

এই ইন্টারনেট পুরো পৃথিবীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন করে আমাদের জীবনযাত্রার মানকে ভিন্ন পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এর কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে যদিও।

ইমেইল

ইলেকট্রিক মেইলের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ই-মেইল। **1971 সালে প্রথম ইমেইল পাঠানো হয়** এবং মাত্র 25 বছরের ভেতরে পোস্ট অফিস ব্যবহার করে পাঠানো চিঠির সংখ্যা থেকে ই-মেইলের সংখ্যা বেশি হয়ে গিয়েছিল! কি মজার ব্যাপার !

কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা ট্যাবলেট বা অন্য কোনো ডিভাইসের মাধ্যমে ইমেইল পাঠাতে হলে ই-মেইল সার্ভার প্রয়োজন হয়। যেমন – Yahoo, Gmail, Hotmail ইত্যাদি। এখানে বিনামূল্যে ইমেইল প্রেরণের পাশাপাশি ইমেইল সংরক্ষণের দায়িত্বও গ্রহণ করেছে। ইমেইল পাঠানোর জন্য প্রেরক এবং প্রাপক উভয়েরই ইমেইল ঠিকানা থাকা আবশ্যক। ইমেইল ঠিকানায় @ এর আগের অংশটি ব্যবহারকারীর কোনো ধরনের পরিচয় এবং পরের অংশ ডোমেইন নেইম, যেটা দিয়ে বোঝানো হয় ব্যবহারকারী কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। **১টি ইমেইল একাধিক গ্রাহককে পাঠানোর জন্য কার্বন কপি (CC) ব্যবহার করা যায়।**

মহাবিশ্ব ও তার গঠন উপাদান Universe and its Constituents

পৃথিবী আমাদের বাসভূমি। এটি সূর্যের একটি গ্রহ। আমাদের ঘিরে থাকা যে অসীম থান বা মহাবিশ্বের একটি অতিক্ষুদ্র ফুটকি (Speck) হল আমাদের এই পৃথিবী। সুতরাং আমাদের ঘিরে বা পৃথিবীকে ঘিরে যা কিছু আছে তাদের সকলকে নিয়েই মহাবিশ্ব। সূর্য হল এই বিশাল মহাবিশ্বের অসংখ্য নক্ষত্রের একটি। অর্থাৎ যেসব তারকা বা নক্ষত্র আমাদের রাতের আকাশকে আলোকিত করে তাদের মত একটি নক্ষত্র হল সূর্য। এই নক্ষত্রগুলো পরস্পর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। পৃথিবীতে যে পরিমাপের সাথে আমরা পরিচিত সে পরিমাপ দিয়ে নক্ষত্রের মধ্যকার দূরত্ব কল্পনা করা যায় না। এদের পরস্পর দূরত্ব মাপতে হয় আলোক বর্ষ দিয়ে। আমরা জানি যে, **আলো প্রতি সেকেন্ডে প্রায় তিনলক্ষ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। এক বৎসর সময়ে আলো যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে তা হল এক আলোক বর্ষ।** এই আলোক বর্ষের এককে নক্ষত্রদের দূরত্ব মাপা হয়। এখানে আমরা মহাবিশ্বের অসীমতা, এর উৎপত্তি ও গঠন উপাদান নিয়ে আলোচনা করব।

মহাবিশ্বের অধিকাংশ জায়গা ফাঁকা। এই মহাবিশ্বে আমাদের পরিচিত একটি জগৎ হল সৌর জগত। সূর্য ও তার নয়টি গ্রহ বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও পুটো এবং উল্কা, নীহারিকা, ধূমকেতু, কৃষ্ণবামন, কৃষ্ণগহ্বর ইত্যাদি নিয়ে সৌরজগত। সুতরাং পৃথিবী সৌরজগতের নয়টি গ্রহের একটি। আমরা বলেছি যে, নক্ষত্রগুলো মহাবিশ্বে পরস্পর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। এসব নক্ষত্র আবার সুষমভাবে বন্টিত নয়। এরা মহাবিশ্বে গুচ্ছ বা ক্লাস্টার বা দল তৈরি করে থাকে। এসব গুচ্ছ বা দলকে একত্রে বলা হয় গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ। এসব ছায়াপথের সংখ্যা প্রায় একশত বিলিয়ন (এক হাজার কোটি)। **সূর্য যে ছায়াপথে রয়েছে তাকে বলা হয় মিলকিওয়ে বা আকাশ গঙ্গা (Milky way)।** এই ছায়াপথে রয়েছে ১০০ বিলিয়ন নক্ষত্র। আর আছে গ্যাস ও ধূলিকণা। মহাবিশ্বে তিন ধরনের আকৃতির ছায়াপথ দেখা যায়- সর্পিল ছায়াপথ, উপবৃত্তাকার ছায়াপথ, অনিয়মিত (irregular) আকৃতি, বিশিষ্ট ছায়াপথ। ছায়াপথের সদস্যদের মধ্য নক্ষত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাতের মেঘমুক্ত চন্দ্রহীন আকাশে আমরা লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র দেখতে পাই। অনেক নক্ষত্র সুন্দর প্যাটার্নে বিন্যস্ত থাকে। এদের বিন্যাস অনুসারে বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে যেমন কালপুরুষ বা ওরিয়ন (orion), দেখতে তীর ধনুক হাতে শিকারীর মত। এছাড়া আছে লুব্ধক, বৃহৎ কুকুর মণ্ডল, সপ্তর্ষিমণ্ডল ও বৃশ্চিক। আধুনিক তত্ত্ব বলে যে, মহাবিশ্ব আপাত (apparently) প্রসারমান (expanding)। এই তত্ত্বের মতে, ছায়াপথগুলো কোন এক সময় সঙ্কুচিত অবস্থায় একত্রে ছিল এবং মহাবিশ্বের বিগ ব্যাঙ বা বৃহৎ বিস্ফোরণ বা মহাবিস্ফোরণের (big bang) মাধ্যমে উৎপত্তি হয়েছে।

নক্ষত্রদের জন্ম ও বিবর্তনও মজার। নক্ষত্রের জীবনচক্র শুরু হয়েছিল ছায়াপথে নিজেদের মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ভেঙে পড়া একটি ঘন মেঘে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের ত্বরণের মাধ্যমে। **এই মেঘ প্রধানত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে তৈরি এবং এর তাপমাত্রা ছিল প্রায়- 173°C।** আমরা জানি যে, সকল বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

এই আকর্ষণ বলের নাম মহাকর্ষ। হাইড্রোজেনের মেঘ যদি ক্ষুদ্র হয় এবং পারিপার্শ্বিক অণুগুলো যদি পরস্পরের নিকটে না থাকে তাহলে তাদের পরস্পরের মধ্যকার আকষণ এমন হয় না যে, তাদের আচরণের কোন পরিবর্তন ঘটতে পারে। মেঘের আকার যদি বড় হয় তাহলে এর প্রতিটি অণুর মধ্যকার মহাকর্ষ বল বেশি হয়, ফলে মেঘকে ভিতরের দিকে টানে। ফলে নিজষ মহাকর্ষ বলের প্রভাবে মেঘগুলো সঙ্কুচিত হতে থাকে একটি নাটকীয় প্রক্রিয়া এবং গ্যাসীয় মেঘ নক্ষত্রে পরিণত হয়। **এই ঘন সংকোচনশীল গ্যাসীয় ভরকে বলা হয় প্রোটোস্টার (Protostar)।**

প্রোটোস্টার যতই সঙ্কুচিত হতে থাকে গ্যাসীয় মেঘের পরমাণুগুলোর পরস্পরের সাথে তত বেশি সংঘর্ষ ঘটে ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সঙ্কুচিত লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে চলতে থাকে। ফলে অন্তথঃ তাপমাত্রা-173 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 10,000,000 (10^7) ডিগ্রি সেলসিয়াসে দাঁড়ায়। এই অতি উচ্চ তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। এই বিক্রিয়ার চারটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস সংযোজিত বা ফিউশনিত হয়ে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি করে এবং যে বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় তা বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি হিসাবে আবির্ভূত হয়। এর তাপমাত্রা ও চাপ আরও বৃদ্ধি পায়। প্রোটোস্টার জ্যোতি ছড়াতে থাকে এবং নক্ষত্রে পরিণত হয়।

নক্ষত্রের ভিতরকার ক্রমবর্ধমান চাপ গ্যাসীয় বস্তুর আরও ভেঙে পড়াকে এগিয়ে দেয়। নক্ষত্রটি এই অবস্থায় দুইটি পরস্পর বিপরীত অভিমুখী বলের প্রভাবে সূক্ষ্ম সাম্যাবস্থায় থাকে। এই দুটি বল হল মহাকর্ষীয় আকর্ষণ যা সঙ্কুচিত করার প্রচেষ্টা চালায় এবং ফিউশন বিক্রিয়াকে প্রজ্জ্বলিত করে। অপরটি ফিউশানের ফলে নির্গত শক্তি দ্বারা উৎপন্ন বা সৃষ্ট অন্তঃ বা আভ্যন্তরীণ চাপ। এই সাম্যাবস্থা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বৎসর চলতে পারে। নক্ষত্রের ভিতরকার তাপমাত্রা ফিউশান বিক্রিয়াকে চালু রাখে। এই বিক্রিয়ার হার সংকোচনের চাপকে সুস্থিত বা সাম্যাবস্থায় রাখার জন্য যথোপযুক্ত থাকে। আমাদের সূর্য এখন তার বিকাশের এরকম একটি সাম্যাবস্থায় আছে। এর সৃষ্টি হয়েছিল 5,000 মিলিয়ন বৎসর পূর্বে, সূর্য ভবিষ্যতে আরও এই পরিমাণ সময় শক্তি বিকিরণ করতে থাকবে।

সূর্যের আছে নয়টি গ্রহ। আবার কোন গ্রহের এক একাধিক উপগ্রহ আছে। পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ, এটি হল চাঁদ।

মহাবিশ্বের উৎপত্তি (Creation of Universe)

নক্ষত্রের কীভাবে উৎপত্তি হল তা আমরা জেনেছি। নক্ষত্র সৃষ্টি হয়েছিল ছায়াপথের অতি ঘন গ্যাসীয় ও ধূলি মেঘের মহাকর্ষীয় ভাঙনের ফলে। গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে নক্ষত্রকে ঘিরে থাকা অবশিষ্ট গ্যাস ও ধূলিকণার ঘনীভবনের ফলে। এরপরও অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়নি। এরকম কয়েকটি প্রশ্ন হল- এই গ্যাসীয় মেঘ কোথা থেকে এল? এদের সৃষ্টি কীভাবে হয়েছিল? মহাবিশ্বের শুরু হয়েছিল কীভাবে? কীভাবে বস্তুবা পদার্থটি সৃষ্টি হয়েছে?

১৯২০ সালে এডুইন হাল (Edwin Hubble) নামে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরিতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে, ছায়াপথগুলি স্থির নয় বরং পরপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এখন আমরা জানি যে, প্রত্যেকটি ছায়াপথ পরপর থেকে দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে-কোন বেলুনকে ফুলালে বা ফুঁ দিয়ে বাতাস ভরে সম্প্রসারিত করলে এর গায়ের দাগগুলি যেমন দুরে সরে যায় ঠিক তেমনি। মনে কর কোন বেলুনের গায়ের ফুট ফুট দাগগুলো যেন এক একটি ছায়াপথ। বেলুন যখন ফুলানো হয় তখন এই দাগগুলি পরপর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, যে দাগগুলো পরস্পর থেকে বেশি দূরে তারা যেন বেশি দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। হাবল বলেন, মহাবিশ্ব ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্ণালীর লাল অপসরণ (red shift) বা লোহিত ভ্রংশ থেকে বোঝা যায় যে, ছায়াপথগুলি দূরে সরে যাচ্ছে। আলোর উৎস মূল পর্যবেক্ষকের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, তখন আলোর কম্পাঙ্ক হ্রাস পেতে থাকে এবং দৃশ্যমান বর্ণালার লোহিত বা লাল রঙের দিকে সরে যায়, একে বলা হয় লাল অপসরণ বা লোহিত ভ্রংশ। হাবল দেখান যে, ছায়াপথের দূরে সরে যাওয়ায় দ্রুতি তাদের পরস্পরের মধ্যকার দূরত্বের সমানুপাতিক। ছায়াপথের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব যত বেশি তাদের সরে যাওয়া দ্রুতি তত বেশি। সুতরাং আমাদের মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে।

১৯২৭ সালে বেলজিয়ামের জ্যোতির্বিজ্ঞানী জি. লেমেটার (G. Lemaitre) মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, দূর অতীতে (15 বিলিয়ন বা 15 শত কোটি বৎসর পূর্বে) মহাবিশ্বের সমস্ত বহু সঙ্কুচিত অবস্থায় একটি বিন্দুর মত ছিল ঠিক যেন একটি অতি-পরমাণু (Superatom)। আজ থেকে ১৫ বিলিয়ন '(১৫ শত কোটি) বৎসর পূর্বে এই অতি-পরমাণুর মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে, ফলে মহাবিশ্ব অবিরতভাবে সম্প্রসারিত হতে থাকে। পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছুটতে থাকে। এসব পুঞ্জ থেকেই তৈরি হয়েছে ছায়াপথ, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি। সেই থেকে মহাবিশ্বের সবকিছু অরিরাম পরস্পর থেকে দূরে যাচ্ছে। আদি এই বিস্ফোরণকে বলা হয় "বিগ ব্যাঙ' বাংলায় একে বলা যেতে পারে "মহাবিস্ফোরণ" বা "বৃহৎ বিস্ফোরণ"।

পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তাঁর "A Brief History of Time" (কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস) গ্রন্থে মহাবিশ্ব 'সৃষ্টির এই "বৃহৎ বিস্ফোরণ তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি দেন এবং পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। এগুলো এড়িয়ে চলার জন্য এর কার্যকর ব্যবহারের সম্পর্কে জানতে হবে।

স্বাস্থ্য সমস্যা :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে যে ধরনের সমস্যা হতে পারে-

- হাতের রগ, স্নায়ু, কব্জি, বাহু, কাঁধ ও ঘাড়ে অতিরিক্ত টান বা চাপ পড়ে।
- কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম না নিয়ে দীর্ঘদিন ও দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারের কাজ করলে চোখের সমস্যা 'কম্পিউটার ভিশন সিন্ড্রোম' হয়। এর কারণে চোখ জ্বালাপোড়া করা, চোখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া, চোখ চুলকানো, চোখ লাল হয়ে যাওয়া এবং চোখের পানি শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে।

কিছু সহজ নিয়ম মানেই এসব সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে পারি। যেমন -

- কম্পিউটারে কাজ করার সময় সঠিকভাবে বসতে হবে এবং সোজা সামনে তাকাতে হবে।
- কাজের ফাঁকে ফাঁকে অত্যন্ত আধাঘন্টা পর পর 5 মিনিটের জন্য হালকা বিশ্রাম নিতে হবে।
- কম্পিউটার স্ক্রিনটি যেন চোখ থেকে 50 – 60 সেন্টিমিটার দূরে থাকে।
- প্রতি 10 মিনিট পর পর কিছুক্ষণের জন্য হলেও দূরের কোনো বস্তুর দিকে তাকাতে হবে, এতে চোখে আরাম বোধ হবে।

মানসিক সমস্যা:

ইন্টারনেটে একদিকে যেমন বিশাল তথ্য ভান্ডার আছে ঠিক সেরকম সামাজিক নেটওয়ার্ক সাইট এবং অশ্লীল ওয়েবসাইট রয়েছে। এগুলোর অপব্যবহার মানসিক চিন্তা ভাবনাকে চরম ভাবে বিপর্যস্ত করতে পারে। তাছাড়া সামাজিক নেটওয়ার্ক কিংবা কম্পিউটার গেম খেলার আসক্তিতো রয়েছেই।

তাই প্রযুক্তিকে অভিশাপ হিসেবে নয়, আশীর্বাদ রূপে বিরাজ করার সুযোগ প্রদান করতে হবে।

SOLVED CQ

Type-1: তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কিত

প্রশ্ন-১: রাফসান তার শিক্ষককে তেজস্ক্রিয় রশ্মি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। শিক্ষক তিনটি কণার কথা বললেন। একই সাথে তিনি তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার ও বিপদসমূহ সম্বন্ধেও আলোচনা করেন।

ক) IC কি ?

খ) তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু ব্যাখ্যা করো।

গ) শিক্ষকদের যে ৩টি কণার কথা বলেছেন তাদের তুলনামূলক চার্ট তৈরি কর।

ঘ) আলোচিত দ্বিতীয় বিষয়টির মানব জীবনে প্রভাব আলোচনা কর।

সমাধান

ক) IC কি ?

ট্রানজিস্টর এর পাশাপাশি ডায়েট কিংবা রেজিস্টার এবং ক্যাপাসিটর বসিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি বর্তনী তৈরি করা হয়। সিলিকনের একটি পাতলা প্লেটে অসংখ্য বর্তনী বসিয়ে প্রাপ্ত নির্মাণকে IC বা সমন্বিত বর্তনী হয়

খ) তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু ব্যাখ্যা করো।

যে পরিমাণ সময়ের ভেতর অর্ধেক সংখ্যক নিউক্লিয়াসের বিকিরণ ঘটে তাই হচ্ছে অর্ধায়ু। অর্থাৎ যে সময়ে কোন তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াসের অর্ধেক হয়, তাকে ওই নিউক্লিয়াসের অর্ধায়ু বলে। একে $T_{\frac{1}{2}}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, কোন মৌলে 800000 টি তেজস্ক্রিয় পরমাণুর আছে। এর অর্ধেক অর্থাৎ 400000 টি পরমাণু ক্ষয় হলে কোন নতুন মৌলে রূপান্তরিত হতে যে সময় লাগে তাকে ওই পদার্থের অর্ধায়ু বলে। পরবর্তী অর্ধায়ুর পর এতে অবশিষ্ট থাকবে 200000 টি পরমাণু। আরো একটি অর্ধায়ুর পর এ পরমাণুর সংখ্যা দাঁড়াবে 100000 টিতে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে একই সময় প্রয়োজন হবে। যেমন, ইউরেনিয়ামের অর্ধায়ু 1620 বছর।

গ) শিক্ষকদের যে ৩টি কণার কথা বলেছেন তাদের তুলনামূলক চার্ট তৈরি করো।

উদ্দীপকে শিক্ষক রাফসানকে যে তিনটি কণার কথা বলেছেন সেগুলো হলো আলফা (α) রশ্মি, বিটা (β) রশ্মি, গামা (γ) রশ্মি। নিম্নে রশ্মি তিনটির তুলনামূলক চার্ট দেওয়া হল :

ক্রমিক নং	α-রশ্মি	β-রশ্মি	γ-রশ্মি
i	ধনাত্মক আধানযুক্ত।	ঋণাত্মক আধানযুক্ত।	আধান নিরপেক্ষ।
ii	তড়িৎ ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয়।	তড়িত ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়।	তড়িত চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয় না।
iii	দ্যুতি তুলনামূলক কম।	দ্রুতি আলোর দ্রুতির শতকরা 50 থেকে 98 ভাগ পর্যন্ত হয়।	দ্রুতি আলোর দ্রুতির সমান।
iv	তীব্র আয়নায়ন সৃষ্টি করতে পারে।	গ্যাসে যথেষ্ট আয়নায়ন সৃষ্টি করতে পারে।	স্বল্প আয়নায়ন ক্ষমতা সম্পন্ন।
v	এর ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর চারগুণ।	ইলেকট্রনের ভরের সমান।	এর কোনো ভর নেই।
vi	ভেদনযোগ্যতা কম। কাগজকে ভেদ করতে পারে।	ভেদনযোগ্যতা মাঝারি। অ্যালুমিনিয়াম কে ভেদ করতে পারে।	ভেদনযোগ্যতা বেশি। সীসাকে ভেদ করতে পারে

ঘ) আলোচিত দ্বিতীয় বিষয়টির মানব জীবনে প্রভাব আলোচনা করো।

শিক্ষকের আলোচিত দ্বিতীয় বিষয়টি হলো তেজস্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহার ও এদের বিপদসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা। মানবজীবনে উক্ত বিষয়ের বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

তেজস্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহার :

- ক্যান্সার রোগ নিরাময়ে তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার বহুল প্রচলিত।
- কিডনির ব্লকেজ, থাইরয়েডের সমস্যা নির্ণয় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়।
- কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত জাতের বীজ তৈরি ও গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সার উৎপাদনের গবেষণায় তেজস্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহার করা হয়।
- যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করতে, কাগজের পুরুত্ব নির্ণয়ে, ধাতব ঝালাই যাচাইয়ে, খনিজ পদার্থে বিভিন্ন ধাতুর উপস্থিতি নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করা হয়।
- প্রাচীন জীবাশ্মের বয়স নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয় C_{14} ব্যবহার করা হয়।

তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিপদসমূহ :

- তেজস্ক্রিয় বিভাজনের ফলে যে সকল রশ্মি বিকরিত হয় তা জীবদেহের মারাত্মক ক্ষতি করে।
- দীর্ঘদিন মাত্রাতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সংস্পর্শে থাকলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। মানসিক বিকার এমনকি বিকলাঙ্গতা সৃষ্টি করতে পারে।
- উচ্চমাত্রায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মানবদেহের নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি করে এই বিকিরণ থেকে মরণঘাতী ক্যান্সার হতে পারে।
- তেজস্ক্রিয় বিকিরণের উৎস হিসেবে কাজ করে তা প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানব জীবনে মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।
- তেজস্ক্রিয় রশ্মি, বিশেষ করে গামা রশ্মির কারণে দেহ পুড়ে যেতে পারে। অকালে চুল পড়ে যেতে পারে।
- তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতিকর প্রভাব বংশপরম্পরায় পরিলক্ষিত হয়।
- 1945 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে এ এলাকায় তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। তার প্রভাব বংশপরম্পরায় আজও ঐ এলাকার মানুষের মাঝে দেখা যায়।

প্রশ্ন-২ : তেজস্ক্রিয়তা একটি স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা। আমাদের জীবনে তেজস্ক্রিয় রশ্মি যেমন উপকার করে, তেমনি অনেক ক্ষতিও করে।

(ক) আইসোটোপ কী ?

(খ) তেজস্ক্রিয়তা একটি নিউক্লিয় ঘটনা— ব্যাখ্যা কর।

(গ) দৈনন্দিন জীবনে তেজস্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহারিক প্রয়োগ বর্ণনা কর।

(ঘ) মাত্রাতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রাণী জগতের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে ? উহার ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

সমাধান

(ক) আইসোটোপ কী ?

একই পারমানবিক সংখ্যা কিন্তু ভিন্ন ভর সংখ্যা বিশিষ্ট পরমাণুকে বলা হয় সেই মৌলের আইসোটোপ।

(খ) তেজস্ক্রিয়তা একটি নিউক্লিয় ঘটনা— ব্যাখ্যা কর।

কোন মৌলের নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশেষ ভেদনশক্তি সম্পন্ন বিকিরণ নির্গত হয়ে নতুন মৌলে রূপান্তরিত হওয়াকে তেজস্ক্রিয়তা বলে।

বিকিরণ নির্গত হওয়ার ঘটনাটি সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত এবং সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত। মানবসৃষ্ট কোন বাহ্যিক প্রভাব, যেমন- চাপ, তাপ, বিদ্যুৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র এই বিকিরণ নির্গমন হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে না। তাই বলা যায় তেজস্ক্রিয়তা একটি নিউক্লিয় ঘটনা।

(গ) দৈনন্দিন জীবনে তেজস্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহারিক প্রয়োগ বর্ণনা কর।

দৈনন্দিন জীবনে তেজস্ক্রিয় রশ্মির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। নিচে এর কয়েকটি প্রয়োগ উল্লেখ করা হলো :-

- চিকিৎসা বিজ্ঞানে: বিশেষ করে দুরারগ্য ক্যান্সার রগ নিরাময়ে তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার আজ বহুল প্রচলিত। এছাড়া বিভিন্ন রগ যেমন কিডনি রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তেজস্ক্রিয় ট্রেসার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

- কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ করে উন্নত জাতের বীজ তৈরি ও গাছের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ধরনের সার উৎপাদনের গবেষণায় তেজস্ক্রিয় ট্রেসার সফলতার সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে।

- শিল্পকারখানাতেও তেজস্ক্রিয় তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন - যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করতে, কাগজকলে কাগজের পুরুত্ব নিয়ন্ত্রণে, আগুনের ধোঁয়ার উপস্থিত নির্ণয়ে, ধাতব ঝালাইয়ে বিভিন্ন ধাতুর পরিমাণ নির্ণয়েও এর ব্যবহার রয়েছে।

- খনিজ পদার্থের বিভিন্ন ধাতুর পরিমাণ নির্ণয়েও এর ব্যবহার রয়েছে।
- এমনকি রোগ নির্ণয়ের কাজেও তেজস্ক্রিয় ট্রেসার বা সঞ্চয়ক সফলতার সাথে কাজে লাগানো হচ্ছে।
- প্রাচীন জীবাশ্মের বয়স নির্ণয়ে C_{14} এর তেজস্ক্রিয় ধর্ম ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) মাত্রাতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রাণী জগতের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে ? উহার ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

তেজস্ক্রিয় রশ্মি যেমনি করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে, কৃষিক্ষেত্রে ও শিল্প কারখানায় বিশেষ ভূমিকা রাখার মাধ্যমে মানুষের জীবনে স্বস্তি বয়ে আনছে, তেমনি করে বিভিন্ন ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আতঙ্কও সৃষ্টি করেছে।

- এই বিকিরণ থেকে জীবনঘাতী দুরারোগ্য ক্যান্সার হতে পারে।
- দীর্ঘদিন মাত্রাতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সংস্পর্শে থাকলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে মানুষ অতি সহজে বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়।
- তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে মানুষের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এমনকি বিভিন্ন ধরনের রোগ ছাড়াও বিকলাঙ্গতা সৃষ্টি হতে পারে।
- তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতিকর প্রভাব বংশপরম্পরায় ও পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ এর ক্ষতিকর প্রভাব সন্তানসন্ততির মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায়, মাত্রাতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রাণী জগতের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রশ্ন-৩ : "ফটোগ্রাফিক প্লেট পরিস্ফুটিত করলে দেখা যাবে যে, প্লেটের উপর তিনটি ভিন্ন দাগ রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় মূল বিকিরণে তিন ধরনের রশ্মি আছে।"— শিক্ষকের পঠিত এই লাইনগুলো সম্পর্কে লিজা গভীর চিন্তা করতে লাগল।

(ক) সমন্বিত বর্তনী কাকে বলে ?

(খ) এক্সরে এর তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখ।

(গ) উদ্দীপকে নির্গত রশ্মি আলফা এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10^{-3} cm হলে এর কম্পাঙ্ক কত? নির্ণয়কর।

(ঘ) শিক্ষকের পঠিত পরীক্ষণের নিঃসৃত রশ্মিগুলোর বৈশিষ্ট্য লিখ।

সমাধান

(ক) সমন্বিত বর্তনী কাকে বলে ?

ট্রানজিস্টর এর পাশাপাশি ডায়োড কিংবা রেজিস্টর এবং ক্যাপাসিটর বসিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি বর্তনী তৈরি করা হয় সিলিকনের একটি পাতলা প্লেটে এরকম অসংখ্য বসিয়ে প্রাপ্ত নির্মাণকে IC বা সমন্বিত বর্তনী বলা হয়।

(খ) এক্সরে এর তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখ।

X-Ray তিনটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :-

- X-Ray একটি উচ্চ ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন রশ্মি।
- X-Ray দৃশ্যমান নয়। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10^{-8} থেকে 10^{-13} এর কাছাকাছি।
- এটি আয়ন সৃষ্টিকারী বিকিরণ গ্যাসের মধ্য দিয়ে যাবার সময় গ্যাসকে আয়নিত করে।

(গ) উদ্দীপকে নির্গত রশ্মি আলফা এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10^{-3} cm হলে এর কম্পাঙ্ক কত? নির্ণয় কর।

দেওয়া আছে, α এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য, $\lambda = 10^{-3}\ cm = 10^{-5}\ m$

আমরা জানি,

আলফা রশ্মির বেগ, $v = \frac{c}{10} = \frac{3\times10^{8}}{10} = 3\times10^{7}\ ms^{-1}$

আবার,

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{3\times10^{7}}{10^{-15}} = 3\times10^{22}\ Hz$$

(ঘ) শিক্ষকের পঠিত পরীক্ষণের নিঃসৃত রশ্মিগুলোর বৈশিষ্ট্য লিখ।

শিক্ষকের পঠিত পরীক্ষণে নিঃসৃত রশ্মিগুলো হলো : আলফা রশ্মি, বিটা রশ্মি এবং গামা রশ্মি। নিম্নে আলফা, বিটা, গামা রশ্মির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো :-

আলফা রশ্মি :-

- আলফা রশ্মি হচ্ছে ধনাত্মক আধানযুক্ত আলফা কণার প্রবাহ এবং আলফা কণা হলেও মূলত একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস।
- এর আধান $3.2\times10^{-19}\ coloumb$।
- একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে থাকে দুটো প্রোটন ও দুটো নিউট্রন। কাজেই এটি চার্জযুক্ত কণা। সে কারণেই এই রশ্মি চৌম্বক ও তড়িৎক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয়।
- এর ভর বেশি হওয়ায় ভেদন ক্ষমতা কম।
- এই রশ্মি জিংক সালফাইড পর্দায় প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।

বিটা রশ্মি :-

- বিটা রশ্মি হচ্ছে বিটা কণা অর্থাৎ ইলেকট্রনের প্রবাহ।
- বিটা রশ্মি যেহেতু e^- তাই এর চার্জ নেগেটিভ এবং সে কারণে এটি বিদ্যুৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়।
- এই রশ্মি অতি দ্রুত নির্গত হয়।
- ফটোগ্রাফিক প্লেটে এর প্রতিক্রিয়া আছে।
- এর ভর খুবই কম, ইলেকট্রনের সমান $(9.11\times10^{-31}\ kg)$ ।

গামা রশ্মি :-

- এটি একটি শক্তিশালী তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। কাজেই এটি আধান নিরপেক্ষ।
- এর দ্রুতি আলোর সমান, অর্থাৎ $3\times10^{8}\ ms^{-1}$।
- এর ভেদন ক্ষমতা আলফা ও বিটা রশ্মির চেয়ে বেশি।
- স্বল্প আয়নায়ন ক্ষমতা সম্পন্ন।
- এটি ভরহীন।
- এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব কম তাই শক্তি খুব বেশি।

প্রশ্ন-৪ :- তেজস্ক্রিয় মৌলের নিউক্লিয়াসগুলো হতে নির্গত আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি ততক্ষণ নির্গত হতে থাকে যতক্ষণ না সম্পূর্ণ নতুন মৌল রূপান্তরিত হয়ে যায়।

(ক) বেকেরেল কী ?

(খ) আলফা রশ্মির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

(গ) রেডিয়ামের অর্ধায়ু 3.82 দিন হলে এর মোট পরমাণুর $\frac{3}{4}$ অংশ ক্ষয় হতে কত সময় লাগবে, তা নির্ণয় কর।

(ঘ) চিকিৎসা ক্ষেত্রে উল্লেখিত রশ্মিগুলোর কার্যকারিতা আলোচনা কর।

সমাধান

(ক) বেকেরেল কী ?

বেকেরেল হল তেজস্ক্রিয়তার একক। প্রতি সেকেন্ডে একটি তেজস্ক্রিয় বিভাজন বা তেজস্ক্রিয় ক্ষয়কে 1 বেকেরেল বলে। একে Bq দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

(খ) আলফা রশ্মির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

আলফা রশ্মির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :-

- আলফা কণা হল মূলত হিলিয়াম নিউক্লিয়াস।
- এর আধান $3\times10^{-19}\ C$।
- ভর বেশি, যার কারণে ভেদন ক্ষমতা কম।

(গ) রেডিয়ামের অর্ধায়ু 3.82 দিন হলে এর মোট পরমাণুর $\frac{3}{4}$ অংশ ক্ষয় হতে কত সময় লাগবে, তা নির্ণয় কর।

দেওয়া আছে, রেডিয়ামের অর্ধায়ু 3.82 দিন।

অর্থাৎ রেডিয়াম মৌলটিতে অবস্থিত মোট পরমাণুর ঠিক অর্ধেক পরিমাণ ক্ষয় হতে সময় লাগে 3.82 দিন। অতএব 3.82 দিনে ক্ষয় হয় $\frac{1}{2}$ অংশ পরমাণু। বাকি $\left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$ অংশ এর অর্ধেক অর্থাৎ $\frac{1}{2\times2}$ বা $\frac{1}{4}$ অংশ ক্ষয় হতে সময় লাগে আর 3.82 দিন।

$\therefore$ মোট পরমাণুর $\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)$ অংশ $=\frac{3}{4}$ অংশ ক্ষয় হতে মোট সময় লাগে $=(3.82+3.82)$ দিন $=7.64$ দিন।

সুতরাং, মোট পরমাণুর $\frac{3}{4}$ অংশ ক্ষয় হতে মোট সময় লাগে 7.64 দিন।

(ঘ) চিকিৎসা ক্ষেত্রে উল্লেখিত রশ্মিগুলোর কার্যকারিতা আলোচনা কর।

বর্তমান যুগে তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার বলে শেষ করা যায় না। চিকিৎসাক্ষেত্রে উল্লেখিত রশ্মি, অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিভিন্ন কার্যকারিতা নিচে আলোচনা করা হলো :-

- তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে রোগাক্রান্ত স্থানের ছবি তোলা সম্ভব যেমন টেকনিশিয়াম-99 কে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করালে সেটি যখন নির্দিষ্ট স্থানে জমা হয় তখন ঐ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে গামা রশ্মি নির্গত হয়। যার কারণে সেই স্থানের ছবি তোলা সম্ভব হয়। খুব কম সময় অর্ধায়ু থাকায় দেহের ক্ষতিও হয় না।
- রোগীকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আয়োডিন-131 সমৃদ্ধ দ্রবণ পান করানো হয়। এই আইসোটোপ থাইরয়েড গ্রন্থি তে প্রবেশ করে বিটা রশ্মি নির্গত করে থাইরয়েডের ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে।
- টিউমার এর উপস্থিতি নির্ণয়ে ও নিরাময়ে কোবাল্ট-60 ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে গামা রশ্মি নির্গত হয়।
- রক্তের লিউকোমিয়া রোগের চিকিৎসায় পটাশিয়াম-32 ব্যবহৃত হয়।

তাহলে পরিশেষে বলা যায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলোর কার্যকারিতা অপরিসীম।

Type-2: অর্ধপরিবাহী, ডায়োড এবং ট্রানজিস্টর সংক্রান্ত
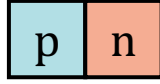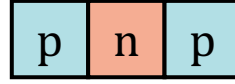
প্রশ্ন-৫ :-

চিত্র-1 চিত্র-2

(ক) তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু কাকে বলে ?

(খ) উপরের চিত্রের কোনটি দিয়ে বর্তনীতে কাজ করা হয় ?

(গ) চিত্র-2 এর যন্ত্রটির গঠন বর্ণনা কর।

(ঘ) চিত্র-1 এর যন্ত্রটি কিভাবে রেকটিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়? বর্ণনা কর।

সমাধান

(ক) তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু কাকে বলে ?

যে পরিমাণ সময়ের ভেতর কোনো তেজস্ক্রিয় পরমানুর অর্ধেক সংখ্যক নিউক্লিয়াসের ঠিক অর্ধেক পরিমাণ ভেঙ্গে যায়, সেটি হচ্ছে অর্ধায়ু।

(খ) উপরের চিত্রের কোনটি দিয়ে বর্তনীতে কাজ করা হয় ?

চিত্র-1 হচ্ছে একটি p-n জাংশন ডায়োড। এটি রেকটিফায়ার বা একমুখীকারক হিসেবে কাজ করে। এটি একটি অর্ধপরিবাহী ডায়োড হিসাবে কাজ করে। এটি অর্ধতরঙ্গ বা পূর্ণতরঙ্গ অসুখীকরণে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র-2 হচ্ছে একটি ট্রানজিস্টর। এটি এমন একটি ডিভাইস যা এমপ্লিফায়ার ও উচ্চ দ্রুতি সুইচ হিসেবে কাজ করে। দুটি n-টাইপ অর্ধপরিবাহী মাঝে p-টাইপ অর্ধপরিবাহী স্যান্ডউইচের মতো জোড়া লাগিয়ে ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয়। এর তিনটি স্তরের অ্যামিটার হচ্ছে বেস ও কালেক্টরের প্রবাহের যোগানদাতা। কালেক্টর প্রবাহের তুলনায় বেস প্রবাহ অনেক কম। তড়িৎ প্রবাহ বিবর্ধনের কাজে ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়।

(গ) চিত্র-2 এর যন্ত্রটির গঠন বর্ণনা কর।

চিত্র-2 এর যন্ত্রটি একটি ট্রানজিস্টর। এটি হলো এমন একটি ডিভাইস যা এমপ্লিফায়ার ও উচ্চ দ্রুতি সুইচ হিসেবে কাজ করে। দুটি n-টাইপ অর্ধপরিবাহীর মাঝে একটি p-টাইপ অর্ধপরিবাহী স্যান্ডউইচের মতো জোড়া লাগিয়ে ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয়। এর তিনটি স্তরকে বলা হয় সংগ্রাহক (কালেক্টর), ভূমি (বেস) ও নিঃসারক (অ্যামিটার)। n-টাইপ অঞ্চল হল ট্রানজিস্টরের সংগ্রাহক ও নিঃসারক এবং সরু টাইপ অঞ্চল হল ভূমি।

একইভাবে দুটি p-টাইপ ও একটি n-টাইপ অর্ধপরিবাহী ব্যবহার করে ট্রানজিস্টর তৈরি করা যায়। যার p-টাইপ অঞ্চল হল সংগ্রাহক, নিঃসারক এবং সরু n-টাইপ অঞ্চল হল ভূমি।
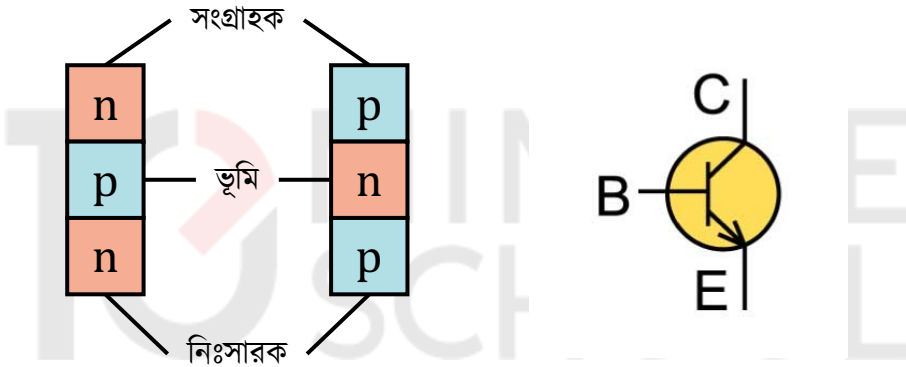
(ঘ) চিত্র-1 এর যন্ত্রটি কিভাবে রেকটিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়? বর্ণনা কর।

উদ্দীপকের চিত্রের ১নং বস্তুটি হল p-n জাংশন। জাংশনে p-টাইপ ও n-টাইপ বস্তুর স্তর তৈরি করা হয়। ফলে বাইরে থেকে কোন ভোল্টেজ প্রয়োগ না করলে তড়িৎ প্রবাহ চলে না। p-n জাংশনে যদি কোনো বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করা হয় তাহলে তড়িৎ প্রবাহ ঘটে। যদি ভোল্টেজ এমনভাবে করা হয় যে, সেলে ধনাত্মক প্রান্ত p-টাইপ বস্তুর সাথে এবং n-টাইপ বস্তুর সাথে ঋণাত্মক প্রান্ত সংযুক্ত হয় তাহলে সেলের ধনাত্মক প্রান্তের e^- p-টাইপ বস্তুর দিকে এবং ঋণাত্মক প্রান্তের হোলগুলোকে n-টাইপ বস্তুর দিকে টানবে। ফলে তড়িৎ প্রবাহ চলে। সুতরাং ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে জাংশন শুধু ইলেকট্রন অভিমুখ প্রবাহের অনুমতি দেয়। সুতরাং এটি রেকটিফায়ার হিসেবে কাজ করে।
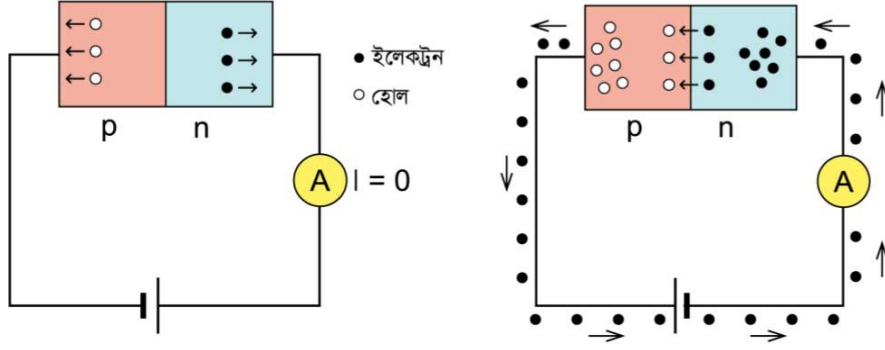
চিত্র : p এবং n যুক্ত করে তৈরি করা ডায়োড। ব্যাটারির সেলের এক সংযোগে কোন বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় না। অন্য সংযোগে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়।

প্রশ্ন-৬ :-
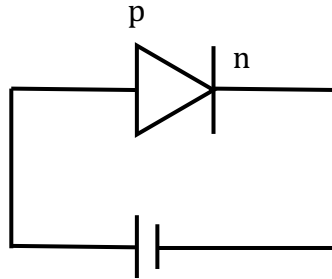
(ক) ডিজিটাল সংকেত কাকে বলে ?

(খ) রাডার এর তিনটি ব্যবহার লেখ।

(গ) উদাহরণ দিয়ে p-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

(ঘ) উদ্দীপকের বর্তনীতে ব্যবহৃত কোষের পরিবর্তনে তড়িৎ প্রবাহের আচরণ বিশ্লেষণ কর ।

সমাধান

(ক) ডিজিটাল সংকেত কাকে বলে ?

যে যোগাযোগ সংকেত শুধু নির্দিষ্ট কিছু মান গ্রহণ করতে পারে, তাকে ডিজিটাল সংকেত বলে।

(খ) রাডার এর তিনটি ব্যবহার লেখ।

রাডার এর তিনটি ব্যবহার নিম্নরূপ :

(১) আক্রমনাত্মক ও রক্ষণাত্মক যুদ্ধাস্ত্রের সঠিক নিয়ন্ত্রণে রাডার ব্যবহৃত হয়।

(২) মিসাইল ব্যবস্থাকে ব্যবহারের নির্দেশনা ও আদেশ দানে ব্যবহৃত হয়।

(৩) দূরপাল্লার শত্রু বিমান বা শত্রু জাহাজ খুঁজে বের করতে রাডার ব্যবহার করা হয়।

(গ) উদাহরণ দিয়ে p-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

যেসকল পদার্থের মধ্য দিয়ে অল্প পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ ঘটে, সেই সকল পদার্থকে অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর বলে। সিলিকন ক্রিস্টাল, জার্মেনিয়াম সেমিকন্ডাক্টর হিসেবে কাজ করে। সেমিকন্ডাক্টরের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধির জন্য অন্য মৌল সেমিকন্ডাক্টর এর সাথে মেশানো হয়। p-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর তৈরীর প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :-

p-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর তৈরীর জন্য সিলিকনের সাথে ত্রিযোজী মৌল, যেমন- বোরন মেশানো হয়। সিলিকনের সাথে বোরন মেশানোর ফলে বোরন পরমাণুর শেষ কক্ষপথের একটা e^- এর জন্য ফাঁকা জায়গা থাকবে এবং পরমাণুটি সেই ফাঁকা জায়গায় পাশের একটা e^- এসে ভরাট করে ফেলতে পারবে। তখন পাশের পরমাণুটিতে একটি ফাঁকা জায়গা হবে। সেই ফাঁকা জায়গাটা পাশের আরেকটা ইলেকট্রন এসে ভরাট করে ফেলতে পারে। তখন আবার সেখানে একটি ফাঁকা জায়গা হবে। অন্যভাবে বলা যায়, e^- এর অভাবমুক্ত একটা ফাঁকা যায়গা পরমাণু থেকে পরমাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটাকে বলা হয় হোল। আর এই সেমিকন্ডাক্টর এর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহন করে পজেটিভ চার্জযুক্ত হোল।

এভাবে শেষ কক্ষপথের তিনটি e^- যুক্ত পরমাণু মিশিয়ে একটি সেমিকন্ডাক্টর পরিবাহকে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে p টাইপ সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করা হয়।

(ঘ) উদ্দীপকের বর্তনীতে ব্যবহৃত কোষের পরিবর্তনে তড়িৎ প্রবাহের আচরণ বিশ্লেষণ কর ।

উদ্দীপকের বর্তনীতে p-n জাংশন ডায়োড ব্যবহার করা হয়েছে। ডায়োডের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, তড়িৎ প্রবাহকে একমুখী করা। p-n জাংশনে দুই ধরনের বায়াসিং ঘটে। একটি হলো সম্মুখী ঝোঁক এবং অপরটি বিপরীতমুখী ঝোঁক।
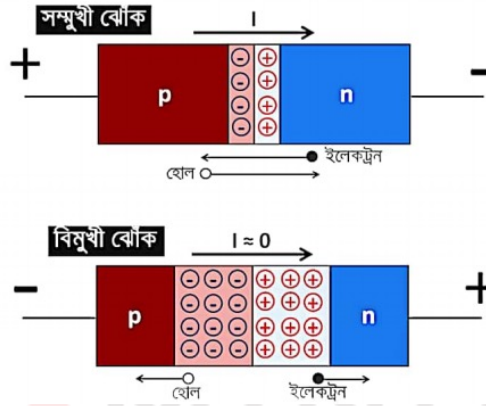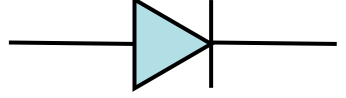
p-n জাংশনের যদি কোন বহিঃস্থ ভোল্টেজ বা বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তড়িৎ প্রবাহ ঘটে। ভোল্টেজ যদি এমন ভাবে প্রয়োগ করা হয় যে, ব্যাটারির বা সেলের ধনাত্মক প্রান্ত p টাইপ বস্তুর সাথে এবং ঋণাত্মক প্রান্ত n-type বস্তুর সাথে সংযুক্ত হয়, তাহলে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত ইলেক্ট্রণগুলোকে p-type বস্তুর দিকে এবং ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্ত হোলগুলোকে n-type বস্তুর দিকে টানবে। ফলে p-n জাংশন ও বহিঃস্থ বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ চলবে। এই প্রবাহ কে বলা হয় সম্মুখী প্রবাহ এবং এই ধরনের সংযোগ কে বলা হয় সম্মুখী ঝোঁক।
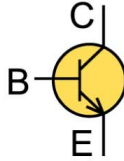
ভোল্টেজ যদি বিপরীত অভিমুখে প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত যদি n-type এবং ঋণাত্মক প্রান্ত যদি p-type বস্তুর সাথে সংযুক্ত করা হয় তাহলে n-type বস্তুতেই থেকে যাবে এবং p-n জংশন পার হয়ে p-type বস্তুতে থেকে যাবে। এতে জংশন দিয়ে কোন তড়িৎ প্রবাহ চলবে না। এ ধরনের সংযোগকে বলা হয় বিমুখী ঝোঁক। উপরোক্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে জংশন শুধু ইলেকট্রনের একমুখী প্রবাহের অনুমতি দেয়। অর্থাৎ এই জংশনে ইলেকট্রনের একমুখী প্রবাহ এটি। তাই এটি রেকটিফায়ার হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন-৭ :-

(ক) মডুলেশন কাকে বলে ?

(খ) ইলেক্ট্রকার্ডিওগ্রাম বলতে কি বুঝায় ? ব্যাখ্যা কর।

(গ) চিত্র-১ (ক) এবং চিত্র-১ (খ) এর মধ্যে কোনটি ব্যবহার সুবিধাজনক? বর্ণনা কর।

(ঘ) "চিত্র-২ (ক) এবং চিত্র-২ (খ) এর সমন্বিত রূপ এর আবিষ্কার আমাদেরকে দিয়েছে অনেক সুবিধা ও আরাম-আয়েশ"—উক্তিটির যথাযথ মূল্যায়ন কর।

সমাধান

(ক) মডুলেশন কাকে বলে ?

শব্দ তরঙ্গকে এক প্রকার উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গের সাথে মিশ্রিত করে মডুলেটেড বা রূপায়িত তরঙ্গ সৃষ্টির প্রক্রিয়াই হচ্ছে মডুলেশন।

(খ) ইলেক্ট্রকার্ডিওগ্রাম বলতে কি বুঝায় ? ব্যাখ্যা কর।

ইলেক্ট্রকার্ডিওগ্রাম (ইসিজি) হল হৃদপিন্ডের একটি রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা। আমরা জানি, বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই হৃদপিণ্ড ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরি করে এবং এই সংকেত পেশীর ভেতর ছড়িয়ে পড়ে। যার কারণে হৃদস্পন্দন হয়। হৃদপিন্ডের এই বৈদ্যুতিক সংকেতগুলো হতে হৃদপিন্ডের স্পন্দন হার এবং ক্ষমতা পরিমাপ করা হয় ইসিজি বা ইলেক্ট্রকার্ডিওগ্রাম পরীক্ষার মাধ্যমে।

(গ) চিত্র-১ (ক) এবং চিত্র-১ (খ) এর মধ্যে কোনটি ব্যবহার সুবিধাজনক? বর্ণনা কর।

উদ্দীপকের যেসব সংকেত উল্লেখ আছে, সেগুলো হলো :- অ্যানালগ সংকেত ও ডিজিটাল সংকেত। এখানে চিত্র-১ (খ) হলো অ্যানালগ সংকেত ও চিত্র-১ (ক) ডিজিটাল সংকেত।

আমরা যা বলি, যা শুনি, যা দেখি তার সবই অ্যানালগ সংকেত। যেমন :- রেডিও, টিভি, অডিও, ভিডিও ইত্যাদি সবই অ্যানালগ সংকেত। তাই অ্যানালগ সংকেত এর রূপান্তর প্রয়োজন হয় না। ফলে অতিরিক্ত ডিভাইস এর প্রয়োজন হয় না। তাই কম ব্যয় বহুল বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে অ্যানালগ সংকেত সুবিধাজনক। কিন্তু অধিক দূরে এই সংকেত প্রেরণ করতে গেলে সমস্যা হয়। এর ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যায়। তাই পথিমধ্যে বারবার সংকেতকে বিবর্ধিত করতে হয়, যা ঝামেলা সাপেক্ষ। অপরদিকে বিবর্ধন করার সময় প্রতিবার কিছু নয়েজ এতে মিশ্রিত হয়। ফলের নয়েজ বেড়ে যায় এবং নয়েজের কারণে মূল সংকেত বিকৃত হয়ে এক সময় হারিয়ে যায়। এই সংকেতের ক্ষেত্রে ক্রস কানেকশন হতে পারে।

অপরদিকে ডিজিটাল সংকেত এর মধ্যবর্তী কোন মান না থাকায় এরা বিকৃত হয় না। একটির সাথে অপরটি মিশে যায় না বলে একই মাধ্যমের মধ্য দিয়ে একাধিক সংকেত প্রেরণ করা যায়। ডিজিটাল সংকেতে কোন ক্রস কানেকশন হয় না। অধিক দূরে প্রেরণের ক্ষেত্রে এই সংকেত দুর্বল হয়ে যায় না বলে কোন বিবর্ধক এর প্রয়োজন হয় না। এই সংকেতগুলো অনেকদিন তথ্য আকারে সংরক্ষণ করা যায় এবং সংকেত এর গুণগত মান অক্ষুন্ন থাকে। তবে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অ্যানালগ সংকেত কে আগে ডিজিটাল এ রূপান্তরিত করে সংরক্ষণ করতে হয় এবং তা পড়ে শোনাবার জন্য বা দেখার জন্য আবার ডিজিটাল সংকেত থেকে অ্যানালগ এ রূপান্তরিত করতে হয়। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ডিভাইসের প্রয়োজন পড়ে, যা ব্যয়বহুল।

(ঘ) "চিত্র-২ (ক) এবং চিত্র-২ (খ) এর সমন্বিত রূপ এর আবিষ্কার আমাদেরকে দিয়েছে অনেক সুবিধা ও আরাম-আয়েশ"—উক্তিটির যথাযথ মূল্যায়ন কর।

ট্রানজিস্টর, রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর, ডায়োড ইত্যাদি ব্যবহার করে অনেক প্রয়োজনীয় সার্কিট তৈরি করা হয়। ধীরে ধীরে প্রযুক্তির উন্নতি হতে থাকে এবং এই ধরনের নানা কিছু ব্যবহার করে তৈরি করা একটি সার্কিট ছোট একটা জায়গার মাঝে ঢুকিয়ে দেওয়া শুরু হলো এবং তার নাম দেওয়া হল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। একটা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট হয়তো একটা নখের সমান। তার ভেতরে প্রথমে হাজার হাজার ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি সার্কিট ঢুকানো শুরু হয় এবং দেখতে দেখতে একটি আইসির ভেতর বিলিয়ন ট্রানজিস্টর পর্যন্ত বসানো সম্ভব হয়ে উঠতে থাকে। এই ছোট্ট চিপ এর ভেতর বিলিয়ন ট্রানজিস্টর ঢোকানোর এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় VLSI বা Very Large Scale Integration। এই প্রক্রিয়াটি এখনো থেমে নেই এবং চিপের ভেতর আরও ট্রানজিস্টর ঢুকিয়ে আরও জটিল সার্কিট তৈরি করার প্রক্রিয়া এখনো চলছে।

একটা চিপ এর ভেতর বিলিয়ন ট্রানজিস্টার ঢুকিয়ে অত্যন্ত জটিল সার্কিট তৈরি করার কারণে আমরা কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ক্যালকুলেটর, চমকপ্রদ মোবাইল টেলিফোন ইত্যাদি অসংখ্য নতুন নতুন ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারছি। একসময় ইলেকট্রনিক্সের যে কাজটি করতে কয়েকটি ঘর কিংবা একটি বিল্ডিং এর প্রয়োজন হতো এখন সেটা একটা ছোট্ট চিপ এর ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে এবং সেগুলো দিয়ে তৈরি নানা ধরনের যন্ত্র আমরা এখন পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি।

তাই আমরা বলতে পারি চিত্র-২ (খ) এর সমন্বিত রূপ অর্থাৎ আইসি আবিষ্কার আমাদেরকে দিয়েছে অনেক সুবিধা ও আরাম-আয়েশ।

Type-3: বিভিন্ন যন্ত্রের কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত

প্রশ্ন-৮ : নাদিম টেলিভিশনে জেএসসি পরীক্ষা নিয়ে একটি খবর দেখছিল। হঠাৎ তার একটা ফোন আসলো। তার বন্ধুর মা ফোন দিয়েছে। তার বন্ধু দুর্ঘটনায় আহত হওয়ায় রক্ত লাগবে শুনে নাদিম দৌড়ে রক্তের ব্যবস্থা করতে বের হয়ে যায়।

(ক) IC কী ?

(খ) ডিজিটাল ও অ্যানালগ সংকেত এর পার্থক্য কী ?

(গ) নাদিম যে মোবাইল ফোনে কথা বলেছে সেটার নেটওয়ার্কিং কৌশল ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন এবং মোবাইলের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ ও তুলনা কর।

সমাধান

(ক) IC কী ?

ট্রানজিস্টর এর পাশাপাশি ডায়োড কিংবা রেজিস্টর এবং ক্যাপাসিটর বসিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি বর্তনী তৈরি করা হয়। সিলিকনের একটি পাতলা প্লেটে এরকম অসংখ্য বর্তনী বসিয়ে প্রাপ্ত নির্মাণকে IC বা সমন্বিত বর্তনী বলে।

(খ) ডিজিটাল ও অ্যানালগ সংকেত এর পার্থক্য কী ?

অ্যানালগ সংকেত ও ডিজিটাল সংকেত এর মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য রয়েছে :

অ্যানালগ সংকেত	ডিজিটাল সংকেত
নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে পরিবর্তনশীল ভোল্টেজ বা কারেন্টকে অ্যানালগ সংকেত বলে।	যে যোগাযোগ সংকেত শুধু নির্দিষ্ট মান গ্রহণ করতে পারে, তাকে ডিজিটাল সংকেত বলে।
দূরত্ব বেশি হলে এর সংকেত এর ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে।	অধিক দূরত্বে সংকেত প্রেরণের জন্য এর সংকেত উত্তম।
অ্যানালগ সিগনাল যেতে যেতে বিবর্ধিত হয় না।	ডিজিটাল সংকেত যেতে-যেতে বিবর্ধিত হয়।

(গ) নাদিম যে মোবাইল ফোনে কথা বলেছে সেটার নেটওয়ার্কিং কৌশল ব্যাখ্যা কর।

নাদিম যে মোবাইল ফোনে কথা বলেছে সেটির নেটওয়ার্কিং মূলত তারবিহীন বা ওয়্যারলেস। কাজেই প্রত্যেকটি মোবাইল ফোন আসলে একই সঙ্গে একটি রেডিও ট্রান্সমিটার এবং একটি রেডিও রিসিভার।

ল্যান্ডফোন তামার তার দিয়ে যুক্ত থাকায় তা ব্যবহার করার জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আসতে হয়। কিন্তু মোবাইল ফোনের জন্য সেরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বরং এই প্রকারের টেলিফোনটি আমরা আমাদের সাথে রেখে যেকোন জায়গায় যেতে পারি এবং যতক্ষণ নেটওয়ার্কের আওতায় থাকি ততক্ষণ যেকোন নম্বরে ফোন দিয়ে যোগাযোগ করতে পারি।

সেক্ষেত্রে এসএমএস এর সুবিধা ও ব্যাপক ভূমিকা রাখে। আর দিয়ে যুক্ত না থাকার কারণেই এটি ওয়্যারলেস রেডিও তরঙ্গ দিয়ে যোগাযোগ করে থাকে।

ল্যান্ডফোনের মতোই সুইচ রিংগার কিপ্যাড মাইক্রফোন ও স্পিকার থাকার পরও মোবাইল ফোনে আরও কয়েকটি বাড়তি বিষয় যুক্ত হয়। এগুলো হলো স্ক্রিন, ব্যাটারি, সিম কার্ড, রিসিভার ও রেডিও ট্রান্সমিটার, ইলেকট্রনিক সার্কিট। মূলত পুর এলাকা কে অনেকগুলো সেলে ভাগ করে নেয়া হয় মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করার কাজটি সম্পন্ন করার সুবিধার্থে। প্রয়োজন অনুযায়ী সেলগুলোর ব্যাসার্ধ 1-20 কিলোমিটার পর্যন্ত হয় আবার প্রতিটি সেলের বেস স্টেশন থাকে। অনেকগুলো স্টেশন কন্ট্রলার এর মাধ্যমে মোবাইল সুইচিং কোড এর সাথে যোগাযোগ করে। কেন্দ্রটি মোবাইল নেটওয়ার্কের একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে সংযোগ করিয়ে দেয়া হয়।

(ঘ) যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন এবং মোবাইলের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ ও তুলনা কর।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্রমাধুনিক। এক সময় মানুষ দূতের মাধ্যমে দূর-দূরান্তে সংবাদ প্রেরণ করতো। এটি ছিল কায়িক শ্রমনির্ভর ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ সাপেক্ষ। কালের বিবর্তনে ক্রমান্বয়ে সংবাদ প্রেরণে যান্ত্রিকতার আগমন ঘটে। যার মধ্যে টেলিভিশন ও মোবাইল অন্যতম। মোবাইল বিনোদন ও যোগাযোগের একটি ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। মোবাইলে আমরা খবর, গান-বাজনা, নাটক, আলোচনা ও বিতর্ক শুনতে পারি। সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য মোবাইল বা সেলুলার ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে যোগাযোগের জন্য টেলিভিশন একটি আধুনিক প্রযুক্তি। এ যন্ত্রটি মাধ্যমে আমরা দূরবর্তী কোনো স্থান থেকে শব্দ শোনার সাথে বক্তার ছবিও দেখতে পাই।

টেলিভিশন ও মোবাইল ফোনের তুলনায় উভয়ই যোগাযোগের অন্যতম বাহক হিসেবে কাজ করে। তবে বর্তমান টেলিভিশনের তুলনায় মোবাইল ব্যাপক ব্যবহৃত ও অধিক নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ মাধ্যম। কারণ শুধু শব্দ শোনা গেলেও বর্তমানে শব্দ শোনার পাশাপাশি ছবিও দেখা যায়। এছাড়া মোবাইল যেকোন জায়গায় বহন করা যায় ও তুলনামূলকভাবে স্বল্পব্যয়ী।

উভয় প্রযুক্তি মানবজীবনে অত্যাধিক প্রভাব ফেললেও এদের মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য রয়েছে:

- মোবাইল ফোন দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা হলেও টেলিভিশন একমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা।
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রিয়জনের কাছে যে কোন অনুষ্ঠানের ছবি, ভিডিও, ইমেইল বা এসএমএস এর মাধ্যমে পাঠিয়ে তার সাথে যোগাযোগ করা যায়। কিন্তু টেলিভিশনের মাধ্যমে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট ছবি বা ভিডিও দেখলে সে সম্পর্কে জানা যায়।

- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যেকোন সময় যেকোন স্থানের খবর সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু টেলিভিশনে তা সম্ভব নয়।

অতএব, উপরক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে, বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থায় টেলিভিশন ও মোবাইলের ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকর।

প্রশ্ন- ৯ :-

(ক) মডুলেশন কী ?

(খ) ভিডিও কনফারেন্সে ব্যবহৃত সংকেত কীরূপ ?

(গ) উপরের চিত্রের যোগাযোগ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

(ঘ) উপরোক্ত যোগাযোগ প্রক্রিয়া কিভাবে মোবাইল যোগাযোগের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর।

সমাধান

(ক) মডুলেশন কী ?

শব্দ তরঙ্গ কে একপ্রকার উচ্চ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গের সাথে মিশ্রিত করে মডুলেটেড বা রূপান্তরিত তরঙ্গ সৃষ্টির প্রক্রিয়াই হচ্ছে মডুলেশন।

(খ) ভিডিও কনফারেন্সে ব্যবহৃত সংকেত কীরূপ ?

ভিডিও কনফারেন্সে ব্যবহৃত সংকেত তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ আকারে প্রেরণ করা হয়। তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ হচ্ছে অ্যানালগ সংকেত। তাই ভিডিও কনফারেন্সে সংকেত গ্রহণ ও প্রেরণ করা হয় অ্যানালগ আকারে। কিন্তু কনফারেন্সে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশের মধ্যে ব্যবহৃত সংকেত ডিজিটাল সংকেত।

(গ) উপরের চিত্রের যোগাযোগ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

উদ্দীপকের চিত্রের রেডিও সম্প্রচার ও গ্রহণ প্রক্রিয়া সংবলিত একটি চিত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

রেডিও সম্প্রচার ও গ্রহণ প্রক্রিয়া :

কোন বেতার সম্প্রচার স্টেশনের স্টুডিওতে কোন ব্যক্তি মাইক্রফোনের সামনে কথা বললে, মাইক্রফোন তড়িৎ তরঙ্গে রূপান্তর করে। এ তরঙ্গের নাম অডিও সংকেত। এই সংকেতের কম্পাঙ্ক বা শক্তি খুব কম। তথ্য বহনকারী কম কম্পাঙ্কের এ তরঙ্গকে তাই একপ্রকার উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গের সাথে মিশ্রিত করা হয়। মিশ্রিত তরঙ্গকে মডুলেটেড বা রূপারপিত তরঙ্গ বলে। রুপারপিত তরঙ্গকে বেতার তরঙ্গও বলা হয়। দুটি তরঙ্গের মিশ্রণকে মডুলেশন বলে। মডুলেটর তরঙ্গকে এমপ্লিফায়ারে বিবর্ধিত করে প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গ হিসেবে শূন্যে প্রেরণ করা হয়। এ তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে এবং ভূমি তরঙ্গ ও আকাশ তরঙ্গ হিসেবে ভাগ হয়ে যায়।

ভূমি তরঙ্গ সরাসরি গ্রাহক অ্যান্টেনার পৌঁছায়। আর আকাশ তরঙ্গ আয়নমন্ডল প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং গ্রাহক অ্যান্টেনার ধরা পড়ে।

গ্রাহক যন্ত্র বেতার তরঙ্গকে গ্রহণ করে তড়িৎ প্রবাহে রূপান্তর করে। এরপর ডিমডুলেশন করে বাহক তরঙ্গ থেকে সংকেত আলাদা করা হয়। এরপর এমপ্লিফায়ার এর সাহায্যে তড়িৎ প্রবাহ বিবর্ধিত করে লাউডস্পিকারে প্রেরণ করা হয়। লাউডস্পিকারে তড়িৎ প্রবাহকে পুনরায় শব্দে রূপান্তরিত করা যায়।

এভাবেই রেডিও তথা উদ্দীপকে উল্লেখিত চিত্রটির মধ্যে যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে।

(ঘ) উপরোক্ত যোগাযোগ প্রক্রিয়া কিভাবে মোবাইল যোগাযোগের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকের রেডিও সম্প্রচার ও গ্রহণ প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে। রেডিও সম্প্রচার ও গ্রহণ প্রক্রিয়া, মোবাইল যোগাযোগের সাথে সম্পর্কিত।

মোবাইল ফোনে যখন কল করা হয়, তখন কলটি বেতার তরঙ্গ হিসেবে কোন প্রেরক-গ্রাহক টাওয়ারে যায়। এরপর কলটি তার বা মাইক্রওয়েভ এর মাধ্যমে মোবাইল সুইচ স্টেশনে যায়। এ স্টেশনে কলটিকে স্থানীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জেও পাঠায়। সেখানে একটি প্রচলিত ফোনকল হয়ে গ্রাহকের নিকট পৌঁছায়।

মোবাইল ফোনের এই প্রেরণ ও গ্রহণ প্রক্রিয়া রেডিও সম্প্রচার ও গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত। রেডিওর ক্ষেত্রে সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে বেতার তরঙ্গকে এন্টেনায় শূন্যে প্রেরণ করা হয় এবং গ্রাহক যন্ত্রের এন্টেনায় গৃহীত হয়ে ডিমডুলেশন হয় এবং পরবর্তীতে বিবর্ধিত হয়। তারপর লাউডস্পিকারে শোনা যায়।

প্রশ্ন-১০ :-

(ক) যোগাযোগ যন্ত্র কাকে বলে ?

(খ) কিভাবে টেলিফোন কাজ করে ব্যাখ্যা কর।

(গ) কিভাবে রেডিও স্টেশন নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের সংকেত সঞ্চালন করে এবং তা গ্রাহকের নিকট পৌঁছায়, চিত্রসহব্যাখ্যা কর।

(ঘ) যোগাযোগের যন্ত্র হিসেবে টেলিভিশন ও রেডিওর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ কর এবং তুলনা কর।

সমাধান

(ক) যোগাযোগ যন্ত্র কাকে বলে ?

তড়িৎ চালিত যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে আমরা দূর-দূরান্তের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সাথে ভাব আদান-প্রদান করতে পারি, বিশ্ববাসীর খবরাখবর জানতে পারি, সেগুলোকে যোগাযোগ যন্ত্র বলা হয়। যেমন: রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন ইত্যাদি।

(খ) কিভাবে টেলিফোন কাজ করে? ব্যাখ্যা কর।

প্রেরকের কাছ থেকে প্রাপ্ত শব্দ তরঙ্গকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করে তারের মধ্য দিয়ে অপর প্রান্তে গ্রাহকের কাছে পুনরায় শব্দ তরঙ্গে রূপান্তরের মাধ্যমে টেলিফোন কাজ করে।

টেলিফোনের হ্যান্ডসেটের মাউথপিসটি হল মাইক্রফোন, একটি প্রেরক যন্ত্র এবং ইয়ার পিস কি হলো স্পিকার, যা একটি গ্রাহক যন্ত্র। আমরা যখন কথা বলি, মাউথপিসের মাইক্রফোনটি কণ্ঠস্বরের শব্দ তরঙ্গকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এর সংকেত টেলিফোনের তার দিয়ে অপর টেলিফোনের ইয়ার পিসে যায়। ইয়ার পিসের স্পিকার তড়িৎ সংকেতকে শব্দে রূপান্তরিত করে। ফলে গ্রাহক বা শ্রতা শব্দ শুনতে পান এবং কথার জবাব দেন।

(গ) কিভাবে রেডিও স্টেশন নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের সংকেত সঞ্চালন করে এবং তা গ্রাহকের নিকট পৌঁছায়, চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

কোন রেডিও সম্প্রচার স্টেশনের স্টুডিওতে যখন কেউ মাইক্রফোনে কোন কথা বলে তখন সেই শব্দ বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়। আমরা 20 Hz থেকে 20,000 Hz কম্পাঙ্ক পর্যন্ত শুনতে পারি। কাজেই শব্দ থেকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত সিগন্যালটিও এই কম্পাঙ্কের হয়।

এটিকে পাঠানোর জন্য উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গের সাথে যুক্ত করা হয়। উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গকে বাহক তরঙ্গ বলে। বাহক তরঙ্গের সাথে সিগনালের যুক্ত করার এই প্রক্রিয়াটিকে মডুলেশন বলে। এই মডুলেটেড তরঙ্গ এমপ্লিফায়ার দিয়ে বিবর্ধিত করে এন্টেনার সাহায্যে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বা রেডিও তরঙ্গ ভূমি হিসেবে কিংবা বায়ুমন্ডলের আয়োনোস্ফিয়্রারে প্রতিফলিত হয় বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে। রেডিও বা গ্রাহক যন্ত্রের ভেতর যে এন্টেনা থাকে, সেটি এই রেডিও তরঙ্গকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তর করে নেয়। এরপর প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার করে বাহক তরঙ্গ থেকে আলাদা করে নেয়া হয়। এই প্রক্রিয়াটিকে ডিমডুলেশন বলা হয়। ডিমডুলেটেড বৈদ্যুতিক সিগন্যালটিকে এমপ্লিফায়ার দিয়ে বিবর্ধন করে শোনার জন্য স্পিকারে পাঠানো হয়।

(ঘ) যোগাযোগের যন্ত্র হিসেবে টেলিভিশন ও রেডিওর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ কর এবং তুলনা কর।

রেডিও ও টেলিভিশন উভয় যোগাযোগের অতীব তাৎপর্যপূর্ণ মাধ্যম। রেডিওতে শুধুমাত্র শব্দ শুনতে পারলেও টেলিভিশনে সেটা দেখাও যায়। আর তাই রেডিওর প্রচলন আমাদের দেশ থেকে দিনদিন উঠে যাচ্ছে। তবুও গ্রামে এমন অনেক জায়গা এখনো আছে যেখানে টেলিভিশনের চেয়ে মানুষ রেডিও বেশি পছন্দ করে এর সহজলভ্যতা ও স্বল্পমূল্যের কারণে। শহরাঞ্চলে অবশ্য রেডিওর প্রচলন তেমন একটা দেখা যায় না। রেডিও এবং টেলিভিশন উভয়ের মাধ্যমে মানুষ দেশ বিদেশের খবরা খবর মুহূর্তের মাঝে জানতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্য টেলিভিশন রেডিওর চেয়ে এগিয়ে। কারণ এক্ষেত্রে টেলিভিশনে বিভিন্ন ঘটনাবলী সরাসরি দেখা সম্ভব।

- রেডিও ও টেলিভিশন এর মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে মানুষকে সচেতন করে গড়ে তোলা সম্ভব। টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের নতুন খবর জানতে পারি।

- কোন খেলা দেখার জন্য আর মাঠে যেতে হয় না। ঘরে বসেই সরাসরি খেলা দেখার আনন্দ উপভোগ করা যায় একমাত্র টেলিভিশনের কারণে। যদিও বিনোদন এবং যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে এখন টেলিভিশন রেডিওর চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় তবুও রেডিওর অবদান ছোট করে দেখার মত নয়।

- রেডিও এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে। সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য রেডিও ব্যবহার করা হয়।

- উপকূলীয় অঞ্চলে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম রেডিও।

SOLVED MCQ

১। কম্পিউটারের পর্দা থেকে চোখ প্রায় কত সে.মি. দূরত্বে রাখতে হবে ? [য.বোর্ড, ২০১৫]

(ক) ৪০-৫০ সে.মি. (খ) ৫০-৬০ সে.মি. (গ) ৮০-১০০ সে.মি. (ঘ) ১০০ সে.মি.

উত্তরঃ (খ) ৫০-৬০ সে.মি.

২। দীর্ঘদীন ও দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারে কাজ করলে চোখে নানান রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়, একে কী বলা হয় ?

(ক) চোখের ত্রুটি (খ) ভিশন সিনড্রোম (গ) চোখ (ঘ) ভিশন প্রবলেম

উত্তরঃ (খ) ভিশন সিনড্রোম

৩। শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ভেতর দিয়ে যদি গামা রশ্মি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে গামা রশ্মি

i. বেঁকে যাবে ii. একই পথে যাবে iii. ক্ষেত্র ভেদ করতে পারবে না

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii

উত্তরঃ (খ) ii

৪। ডিজিটাল সংকেত হলো [ঢা.বোর্ড, ২০১৬]

i. অডিট ভিডিও ভোল্টেজ ii. বাইনারি কোড iii. নির্দিষ্ট মান

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তরঃ (গ) ii ও iii

৫। ডিজিটাল সংকেত এর সুবিধা—

i. প্রতি সেকেন্ডে অনেক বেশি সংকেত প্রেরণ করা যায়

ii. নয়েজ বেশি

iii. দূরত্ব অতিক্রম এর সাথে সাথে এই সংকেত বিবর্ধিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) ii (গ) i ও iii (ঘ) i ও iii

উত্তরঃ (ঘ) i ও iii

৬। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য নিচের কোনটির দরকার নয় ?

(ক) গ্রাহক কম্পিউটার (খ) টেলিফোন লাইন

(গ) প্রেরক কম্পিউটার (ঘ) ওপরের কোনোটিই নয়

উত্তরঃ (ঘ) ওপরের কোনোটিই নয়

৭। তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপের জন্য যে একক ব্যবহার করা হয় তার নাম কি ? [সি.বোর্ড, ২০১৫]

(ক) বেকেরেল (খ) ওহম (গ) রন্টজেন (ঘ) ওয়েরস্টেড

উত্তরঃ (ক) বেকেরেল

৮। নিচের কোনটি অর্ধপরিবাহী ? [দি.বোর্ড, ২০১৫]

(ক) লোহা (খ) তামা (গ) জার্মেনিয়াম (ঘ) আর্গন

উত্তরঃ (গ) জার্মেনিয়াম

৯। নিচের কোনটির মাধ্যমে প্রেরকযন্ত্র রুপরোপিত তরঙ্গকে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ হিসেবে শুন্যে প্রেরণ করে ?

[দি.বোর্ড, ২০১৫]

(ক) স্পিকার (খ) এমপ্লিফায়ার (গ) অ্যান্টেনা (ঘ) মাইক্রোফোন

উত্তরঃ (ক) বেকেরেল

১০। কম্পিউটারের অন্তর্গামী ডিভাইস কোনটি ? **[ব.বোর্ড, ২০১৭]**

(ক) র‍্যাম (খ) স্ক্যানার (গ) রম (ঘ) স্পিকার

উত্তরঃ (খ) স্ক্যানার

১১। ডিজিটাল সংকেতে কোন অংকদ্বয় ব্যবহৃত হয় ? **[ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ]**

(ক) 1 & 2 (খ) 2 & 4 (গ) 0 & 1 (ঘ) 0 & 2

উত্তরঃ (গ) 0 & 1

১২। একটি সিলিকন চিপ এর মধ্যে লক্ষ লক্ষ বর্তনী সংযুক্ত করা হলে তাকে কি বলে ?

[ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ]

(ক) সমান্তরাল বর্তনী (খ) সেমিকন্ডাক্টর ট্রানজিস্টর

(গ) সমন্বিত বর্তনী (ঘ) অর্ধপরিবাহী ডায়োড

উত্তরঃ (গ) সমন্বিত বর্তনী

১৩। ডায়োড কি হিসেবে ব্যবহার করা হয় ? **[সিলেট ক্যাডেট কলেজ]**

(ক) সুইচ (খ) বিবর্ধক (গ) সঞ্চয়ক (ঘ) চার্জার

উত্তরঃ (ক) সুইচ

১৪। বর্তনীতে ট্রানজিস্টর কি হিসেবে ব্যবহৃত হয় ? **[চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম]**

(ক) রেকটিফায়ার ও নিঃসারক | (খ) বিবর্ধক ও রেকটিফায়ার

(গ) নিঃসারক ও সুইচ | (ঘ) বিবর্ধক ও সুইচ

উত্তরঃ (ঘ) বিবর্ধক ও সুইচ

১৫। যে প্রক্রিয়ায় বাহক তরঙ্গ হতে শব্দতরঙ্গ আলাদা করা হয় ?

[মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

(ক) রুপারোপন (খ) বিরুপারোপন (গ) মডুলেশন (ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তরঃ (গ) মডুলেশন

১৬। এনালগ সংকেত কোনটি ? **[বগুড়া জিলা স্কুল]**

(ক) অডিও ভোল্টেজ (খ) এসি ভোল্টেজ (গ) ডিসি ভোল্টেজ (ঘ) একমুখী ভোল্টেজ

উত্তরঃ (ক) অডিও ভোল্টেজ

১৭। টেলিফোনের ইয়ার পিসের স্পিকার রূপান্তর করে?

[নবাব ফয়জুন্নেসা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

(ক) তড়িৎ সংকেতকে চৌম্বকে | (খ) চৌম্বককে তড়িৎ সংকেতে

(গ) তড়িৎ সংকেতকে শব্দে | (ঘ) শব্দকে তড়িৎ সংকেতে

উত্তরঃ (গ) তড়িৎ সংকেতকে শব্দে

১৮। টেলিভিশনে শব্দ ও ছবি কিভাবে প্রেরণ করা হয় ?

[জালালবাদ ক্যান্টনম্যান্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

(ক) বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে

(খ) তড়িত চৌম্বক তরঙ্গের মাধ্যমে

(গ) ভূমি তরঙ্গের মাধ্যমে

(ঘ) আকাশ তরঙ্গের মাধ্যমে

উত্তরঃ (খ) তড়িত চৌম্বক তরঙ্গের মাধ্যমে

১৯। অধিক দূরত্বে তথ্য পাঠাতে কোন সংকেত সর্বোত্তম ? **[কাদিরাবাদ ক্যান্টন্যান্ট পাবলিক স্কুল, নাটোর]**

(ক) এনালগ সংকেত

(খ) মোর্স সংকেত

(গ) ডিজিটাল সংকেত

(ঘ) তড়িৎ সংকেত

উত্তরঃ (গ) ডিজিটাল সংকেত

২০। তেজস্ক্রিয়তার বিকিরণ এর ফলে মৌলের— **[তাসলিমা মেমোরিয়াল একাডেমী, পাথরঘাটা, বরগুনা]**

i. পারমাণবিক সংখ্যা কমে

ii. পারমাণবিক সংখ্যা বাড়ে

iii. ভর সংখ্যা কমে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তরঃ (খ) i ও iii

২১। আলফা কণার বৈশিষ্ট্য— [ঢা.বোর্ড, ২০১৯]

i. এই কণা চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়

ii. এর ভর $9.11\times10^{-23}\ kg$

iii. এই কণা জিংক সালফাইট পর্দায় প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তরঃ (খ) i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

তিনটি ভিন্ন বিকিরণের মধ্যে প্রথমটি তীব্র আয়নায়ন ক্ষমতা সম্পন্ন। দ্বিতীয়টির দ্রুতি আলোর দ্রুতির শতকরা 50 ভাগ হতে 98 ভাগ। তৃতীয়টি ভরহীন।

২২। প্রথম বিকিরণটি হল—

(ক) আলফা (খ) বিটা (গ) গামা (ঘ) এক্স

উত্তরঃ (ক) আলফা

২৩। উপরোক্ত বিকিরণদ্বয়ের ক্ষেত্রে—

i. তৃতীয়টি চুম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয় না

ii. প্রথমটির মধ্যে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন আছে

iii. দ্বিতীয়টি জিংক সালফাইট পর্দায় প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তরঃ (ঘ) i, ii ও iii

২৪। একটি তেজস্ক্রিয় মৌলে 8,00,000 টি পরমাণু আছে। মৌলটির অর্ধায়ু 100 বছর। পরমাণুগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে 1,00,000 টি পরমাণুতে পরিণত হতে কত সময় লাগবে ?

[ব্রাহ্মন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, নরসিংদী]

(ক) 100 বছর (খ) 200 বছর (গ) 300 বছর (ঘ) 400 বছর

উত্তরঃ (গ) 300 বছর

ব্যাখ্যা :

প্রথম 100 বছরে,

ক্ষয় হবে $= \frac{1}{2}$ অংশ

$\therefore$ অবশিষ্ট $= 1 - \frac{1}{2}$ অংশ

$= \frac{1}{2} = \frac{800000}{2} = 400000$ টি

পরবর্তী 100 বছরে,

ক্ষয় হবে $= (\frac{1}{2}$ এর $\frac{1}{2})$ অংশ $= \frac{1}{4}$ অংশ

$= \frac{800000}{4}$

$= 200000$

$\therefore$ অবশিষ্ট $= 400000 - 200000 = 200000$ টি

পরবর্তী 100 বছরে,

ক্ষয় হবে $= (\frac{1}{4}$ এর $\frac{1}{4})$ অংশ $= \frac{1}{8}$ অংশ

$= \frac{800000}{8}$ টি

$= 100000$ টি

$\therefore$ অবশিষ্ট $= 200000 - 100000 = 100000$ টি

$\therefore$ মোট সময় $= 100 + 100 + 100 = 300$ বছর

২৫। কোন তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু 500 বৎসরের $\frac{3}{4}$ অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে কত বছর সময় লাগবে ?

[বিন্দুবাসিনী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাংগাইল]

(ক) 250 (খ) 500 (গ) 1000 (ঘ) 1500

উত্তরঃ (গ) 1000

ব্যাখ্যা :

$\frac{1}{2}$ ক্ষয় হয় 500 বছরে

$\left\{\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} \text{ এর} \frac{1}{2}\right)\right\}$ ক্ষয় হয় $= 500 + 500$ বছরে

$\therefore \frac{3}{4}$ ক্ষয় হয় $= 1000$ বছরে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সময় (দিন)	0	1	2	3
তেজস্ক্রিয় মৌলের পরমাণুর সংখ্যা	10^5	70000	50000	35000

২৬। উদ্দীপকের মৌলটির অর্ধায়ু কত ?

(ক) 43200s (খ) 86400s (গ) 129600s (ঘ) 172800s

উত্তরঃ (ঘ) 172800s

ব্যাখ্যা :

অর্ধায়ু সময়ে মৌলের পরমাণুর সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়।

$\therefore 10^5$ এর অর্ধেক $= \frac{10^{-5}}{2} = 5000$

$\therefore$ চার্ট অনুযায়ী সময় $= 2$ দিন

$= 2 \times 24 \times 60 \times 60$

$= 172800s$

২৭। আলোচ্য মৌলটির ক্ষেত্রে— **[রা.বোর্ড, ২০১৯]**

i. পরমাণু ভাঙ্গনের হার ক্রমান্বয়ে কমতে থাকবে

ii. প্রতি চার দিনে পরমাণুর সংখ্যা 25% কমে যাবে

iii. সবগুলো পরমাণু ভেঙ্গে যেতে অসীম পরিমাণ সময় লাগবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তরঃ (খ) i ও iii

২৮। নিচের কোনটি p-n-p ট্রানজিস্টর ?

(ক) b c e

(গ)

(খ)

(ঘ)
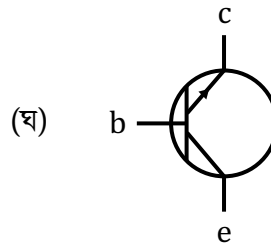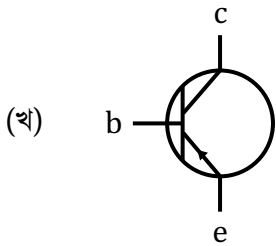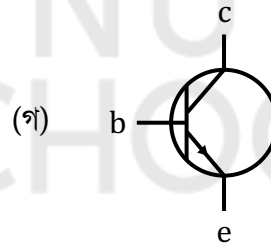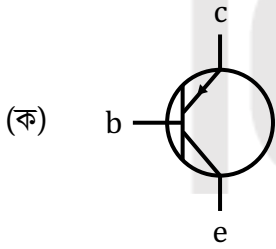
উত্তরঃ (গ)

২৯। অর্ধপরিবাহী পদার্থ কোনটি ? **[দি. বোর্ড, ২০১৭; ঢা.বোর্ড, ২০১৫; দি. বোর্ড, ২০১৫; ঢা.বোর্ড, ২০১৯]**

(ক) সিজিয়াম (খ) জার্মেনিয়াম (গ) কাঁচ (ঘ) প্লাস্টিক

উত্তরঃ (খ) জার্মেনিয়াম

৩০। p-type অর্ধপরিবাহী তৈরিতে ভেজাল হিসেবে কত যোজী মৌল ব্যবহৃত হবে ?

[কু. বোর্ড, ২০১৯; সি.বোর্ড, ২০১৯; রা.বোর্ড, ২০১৭; চ.বোর্ড, ২০১৬; সি.বোর্ড, ২০১৬]

(ক) ৩ (খ) ৪ (গ) ৫ (ঘ) ৭

উত্তর: (ক) ৩

৩১। একটি p টাইপ অর্ধপরিবাহী তৈরী করতে বিশুদ্ধ সিলিকনের সাথে কোন মৌলটি যোগ করা হয় ?

[কু. বোর্ড, ২০১৯; সি.বোর্ড, ২০১৯; রা.বোর্ড, ২০১৭; চ.বোর্ড, ২০১৬; সি.বোর্ড, ২০১৬]

(ক) ফসফরাস (খ) কার্বন (গ) অ্যান্টিমনি (ঘ) বোরন

উত্তরঃ (ঘ) বোরন

৩২। অর্ধপরিবাহী ডায়োডকে কি বলা হয় ? **[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]**

(ক) অন্তরক (খ) ট্রানজিস্টর (গ) এমপ্লিফায়ার (ঘ) রেকটিফায়ার

উত্তরঃ (ঘ) রেকটিফায়ার
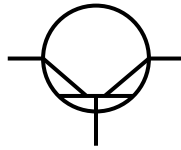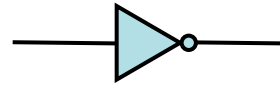
চিত্র A চিত্র C চিত্র B

৩২। চিত্র A-এর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক ? **[চ. বোর্ড, ২০১৯]**

(ক) নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হয়
(খ) ছিন্নায়িত মানে পরিবর্তিত হয়
(গ) ক্রস কানেকশন হতে পারে
(ঘ) বাঁচিয়ে রাখতে পুনঃবিবর্ধন করতে হয়

উত্তরঃ (খ) ছিন্নায়িত মানে পরিবর্তিত হয়